প্রহাসিনী

প্রহাসিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

শিরোনাম-সূচী

· বিন্দুচিহ্নিত কবিতাগুলি সংযোজন-ধৃত বা গ্রন্থপরিচয়ভুক্ত। শেষোক্ত পর্যায়ে কবির মুখ্য রচনা চারিটি : পত্রদূতী। মধুসন্ধায়ী (৫)। দিদিমণি (পাঠভেদ)। সুধাকান্ত।

প্রথম ছত্রের সূচী

ধূমকেতু মাঝে মাঝে হাসির ঝাঁটায়
দ্যুলোক ঝাঁটিয়ে নিয়ে কৌতুক পাঠায়
বিস্মিত সূর্যের সভা ত্বরিতে পারায়ে—
পরিহাসচ্ছটা ফেলে সুদূরে হারায়ে,
সৌর বিদূষক পায় ছুটি।

আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু,
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু—
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।

এ জগৎ মাঝে মাঝে কোন্ অবকাশে
কখনো বা মৃদুস্মিত কভু উচ্চহাসে
হেসে ওঠে, দেখা যায় আলোকে ঝলকে—
তারা কেহ ধ্রুব নয়, পলকে পলকে
চিহ্ন তার নিয়ে যায় মুছে।

তিমির-আসনে যবে ধ্যানমগ্ন রাতি
উল্কাবরিষনকর্তা করে মাতামাতি—
দুই হাতে মুঠা মুঠা কৌতুকের কণা
ছড়ায় হরির লুঠ, নাহি যায় গনা,
প্রহর-কয়েকে যায় ঘুচে।

অনেক অদ্ভুত আছে এ বিশ্বসৃষ্টিতে
বিধাতার স্নেহ তাহে সহাস্য দৃষ্টিতে।
তেমনি হালকা হাসি দেবতার দানে
রয়েছে খচিত হয়ে আমার সম্মানে—
মূল্য তার মনে মনে জানি।

এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি
হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাবলামি।
এ নিয়ে প্রবীণ যদি করে রাগারাগি
বিধাতার সাথে তারে করি ভাগাভাগি
হাসিতে হাসিতে লব মানি।

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
পৌষ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রহাসিনী

আধুনিকা

চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর,
তাপ কিছু আছে তাহে, সন্তাপ তাই মোর।
কবিগিরি ফলাবার উৎসাহ-বন্যায়
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্যায়
যদি সন্দেহ কর এত বড়ো অবিনয়,
চুপ ক'রে যে সহিবে সে কখনো কবি নয়।
বলিব দু-চার কথা, ভালো মনে শুনো তা ;
পূরণ করিয়া নিয়ো প্রকাশের ন্যূনতা ॥

প্রহাসিনী

পাঁজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্তর
আমি তো তদনুসারে পেরিয়েছি সত্তর।
আয়ুর তবিল মোর কুষ্ঠির হিসাবে
অতি অল্প দিনেই শূন্যেতে মিশাবে।
চলিতে চলিতে পথে আজকাল হরদম
বুকে লাগে যমরথচক্রের কর্দম।
তবু মোর নাম আজো পারিবে না ওঠাতে
প্রাত্নিক তত্ত্বের গবেষণা-কোঠাতে।
জীর্ণ জীবনে আজ রঙ নাই, মধু নাই—
মনে রেখো, তবু আমি জন্মেছি অধুনাই।
সাড়ে আঠারো শতক এ. ডি., সে যে বি. সি. নয়;
মোর যারা মেয়ে-বোন নারদের পিসি নয়।
আধুনিকা যারে বল তারে আমি চিনি যে,
কবিযশে তারি কাছে বারো আনা ঋণী যে।
তারি হাতে চিরদিন যৎপরোনাস্তি
পেয়েছি পুরস্কার, পেয়েছিও শাস্তি।
প্রমাণ গিয়েছি রেখে, এ-কালিনী রমণীর
রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর।
কাছে পাই হারাই-বা তবু তারি স্মৃতিতে
সুরসৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে।
মনোলোকে দূতী যারা মাধুরীনিকুঞ্জে
গুঞ্জন করিয়াছি তাহাদেরি গুণ-যে।

আধুনিকা

সেকালেও কালিদাস-বররুচি-আদিরা
পুরসুন্দরীদের প্রশস্তিবাদীরা
যাদের মহিমাগানে জাগালেন বীণারে
তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে।
আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না,
তাহাদেরি কল্যাণে কাব্যানুশীলনা।
পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো সুগ্রহ,
চিরকাল তাই তারে এত মহানুগ্রহ।
জুতা-পায়ে খালি-পায়ে স্লিপারে বা নূপুরে
নবীনারা যুগে যুগে এল দিনে দুপুরে,
যেথা স্বপনের পাড়া সেথা যায় আগিয়ে,
প্রাণটাকে নাড়া দিয়ে গান যায় জাগিয়ে।
তবু কবি-রচনায় যদি কোনো ললনা
দেখো অকৃতজ্ঞতা, জেনো সেটা ছলনা।
মিঠে আর কটু মিলে, মিছে আর সত্যি,
ঠোকাঠুকি ক'রে হয় রস-উৎপত্তি।
মিষ্ট-কটুর মাঝে কোন্‌টা যে মিথ্যে
সে কথাটা চাপা থাক্ কবির সাহিত্যে।
ওই দেখো, ওটা বুঝি হল শ্লেষবাক্য।
এরকম বাঁকা কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্য।
প্রলোভনরূপে আসে পরিহাসপটুতা,
সামলানো নাহি যায় অকারণ কটুতা।

বারে বারে এইমতো করি অত্যুক্তি,
ক্ষমা করে কোরো সেই অপরাধমুক্তি

আর যা-ই বলি নাকো এ কথাটা বলিবই,
তোমাদের দ্বারে মোরা ভিক্ষার থলি বই।
অন্ন ভরিয়া দাও সুধা তাহে লুকিয়ে,
মূল্য তাহারি আমি কিছু যাই চুকিয়ে।
অনেক গেয়েছি গান মুগ্ধ এ প্রাণ দিয়ে—
তোমরা তো শুনেছ তা, অন্তত কান দিয়ে।
পুরুষ পরুষ ভাষে করে সমালোচনা,
সে অকালে তোমাদেরি বাণী হয় রোচনা।
করুণায় ব'লে থাকো, "আহা, মন্দ বা কী।"
খুঁটে বের কর না তো কোনো ছন্দ-ফাঁকি।
এইটুকু যা মিলেছে তাই পায় কজনা,
এত লোক করেছে তো ভারতীর ভজনা।
এর পরে বাঁশি যবে ফেলে যাব ধূলিতে
তখন আমারে ভুলো পার যদি ভুলিতে।
সেদিন নূতন কবি দক্ষিণপবনে
মধুঋতু মুখরিবে তোমাদের স্তবনে—
তখন আমার কোনো কীটে-কাটা পাতাতে
একটা লাইনও যদি পারে মন মাতাতে

তা হলে হঠাৎ বুক উঠিবে যে কাঁপিয়া
বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া ॥

এ কী গেরো। কাজ কী এ কল্পনাবিহারে,
সেন্টিমেণ্টালিটি বলে লোকে ইহারে।
ম'রে তবু বাঁচিবার আবদার খোকামি,
সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি।
এটা তো আধুনিকার সহিবে না কিছুতেই ;
এস্‌টিমেশনে তার পড়ে যাব নিচুতেই।
অতএব, মন, তোর কলসি ও দড়ি আন্‌,
অতলে মারিস ডুব মিড্‌-ভিক্‌টোরিয়ান।
কোনো ফল ফলিবে না আঁখিজল-সিচনে ;
শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে।
গদ্‌গদ স্বর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
শেষ বেলা কেটে যাক ঠাট্টায় ঠাট্টায় ॥

তোমাদের মুখে থাক্‌ হাস্যের রোশনাই—
কিছু সীরিয়াস কথা বলি তবু, দোষ নাই।
কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী।
শুধু এ-কালিনী নয়, যারা চিরকালিনী।

এ কথাটা ব'লে যাব মোর কন্‌ফেশানেই
তাদের মিলনে কোনো ক্ষণিকের নেশা নেই।
জীবনের সন্ধ্যায় তাহাদেরি বরণে
শেষ রবিরেখা রবে সোনা-আঁকা স্মরণে।
সুর-সুরধুনীধারে যে অমৃত উথলে
মাঝে মাঝে কিছু তার ঝ'রে পড়ে ভূতলে,
এ জনমে সে কথা জানার সম্ভাবনা
কেমনে ঘটিবে যদি সাক্ষাৎ পাব না।
আমাদের কত ত্রুটি আসনে ও শয়নে,
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে।
প্রেমদীপ জ্বেলেছিল পুণ্যের আলোকে,
মধুর করেছে তারা যত কিছু ভালোকে।
নানারূপে ভোগসুধা যা করেছে বরষন
তারে শুচি করেছিল সুকুমার পরশন।
দামি যাহা মিলিয়াছে জীবনের এ পারে
মরণের তীরে তারে নিয়ে যেতে কে পারে।
তবু মনে আশা করি, মৃত্যুর রাতেও
তাহাদেরি প্রেম যেন নিতে পারি পাথেয়।
আর বেশি কাজ নেই, গেছে কেটে তিনকাল,
যে কালে এসেছি আজ সে কালটা সিনিকাল।
কিছু আছে যার লাগি সুগভীর নিশ্বাস
জেগে ওঠে— ঢাকা থাক্ তার প্রতি বিশ্বাস॥

একটু সবুর করো, আরো কিছু বলে যাই,
কথার চরম পারে তার পরে চলে যাই।
যে গিয়েছে তার লাগি খুঁচিয়ো না চেতনা,
ছায়ারে অতিথি ক'রে আসনটা পেতো না।
বৎসরে বৎসরে শোক করা রীতিটার
মিথ্যার ধাক্কায় ভিত ভাঙে স্মৃতিটার।
ভিড় ক'রে ঘটা-করা ধরা-বাঁধা বিলাপে
পাছে কোনো অপরাধ ঘটে প্রথা-খিলাপে,
ভারতে ছিল না লেশ এই-সব খেয়ালের—
কবি-'পরে ভার ছিল নিজ মেমোরিয়ালের।
"ভুলিব না, ভুলিব না" এই ব'লে চীৎকার
বিধি না শোনেন কভু, বলো তাহে হিত কার।
যে ভোলা সহজ ভোলা নিজের অলক্ষ্যে
সে-ই ভালো হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে।
শুষ্ক উৎস খুঁজে মরুমাটি খোঁড়াটা,
তেলহীন দীপ লাগি দেশালাই পোড়াটা,
যে-মোষ কোথাও নেই সেই মোষ তাড়ানো,
কাজে লাগিবে না যাহা সেই কাজ বাড়ানো—
শক্তির বাজে ব্যয় এরে কয় জেনো হে,
উৎসাহ দেখাবার সদুপায় এ নহে।
মনে জেনো জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ—
স্থায়ী যাহা, আর যাহা থাকার অযোগ্য,

সকলি আহুতিরূপে পড়ে তারি শিখাতে,
টিঁকে না যা কথা দিয়ে কে পারিবে টিঁকাতে।
ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে ॥

লাহোর
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫
[৩ ফাল্গুন ১৩৪১]

নারীপ্রগতি

শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল
পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে—
হেন বীরনারী আছে কি গৌড়ে
নারীপ্রগতির মহাদিনে আজি
নারীপদগতি জিনিল এ বাজি ॥

হায় কালিদাস, হায় ভবভূতি,
এই গতি আর এই-সব জুতি
তোমাদের গজগামিনীর দিনে
কবিকল্পনা নেয় নি তো চিনে ;
কেনে নি ইস্‌টিশনের টিকেট ;
হৃদয়ক্ষেত্রে খেলে নি ক্রিকেট
চণ্ড বেগের ডাণ্ডাগোলায় ;—
তারা তো মন্দ-মধুর দোলায়
শান্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে
বেঁধেছিল মন শিথিল ছন্দে ॥

প্রহাসিনী

রেলগাড়ি আর মোটরের যুগে
বহু অপঘাত চলিয়াছি ভুগে—
তাহারি মধ্যে এল সম্প্রতি
এ দুঃসাহস, এ তড়িৎগতি ;
পুরুষেরে দিল দুর্দাম তাড়া,
দুর্বার তেজে নিষ্ঠুর নাড়া।—
ভূকম্পনের বিগ্রহবতী
প্রলয়ধাতার নিগ্রহ অতি
বহন করিয়া এসেছে বঙ্গে
পাদুকামুখর চরণভঙ্গে ॥

সে ধ্বনি শুনিয়া পরলোকে বসি,
কবি কালিদাস, পড়িল কি খসি
উষ্ণীষ তব ; দুরুদুরু বুকে
ছন্দ কিছু কি জুটিয়াছে মুখে।
একটি প্রশ্ন শুধাব এবার—
অকপটে তারি জবাব দেবার
আগে একবার ভেবে দেখো মনে,
উত্তর পেলে রাখিব গোপনে—

নারীপ্রগতি

স্নিগ্ধচ্ছায়া ছিলে যে অতীতে
তেয়াগিয়া তাহা তড়িৎগতিতে
নিতে চাও কভু তীব্রভাষণ
আধুনিকাদের কবির আসন ?
মেঘদূত ছেড়ে বিদ্যুৎ-দূত
লিখিতে পাবে কি ভাষা মজবুত

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩৪১

রঙ্গ

'এ তো বড়ো রঙ্গ' ছড়াটির অনুকরণে লিখিত

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিঠে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি—
তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি॥

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার সাদা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি—
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি॥

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার তিতো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের শুক্ত—
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত॥

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার কঠিন দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা—
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা॥

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিথ্যে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না—
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না॥

[বরানগর
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪
৮ আশ্বিন ১৩৪১]

পরিণয়মঙ্গল

তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা,
অক্ষয় হয়ে থাক্ সিঁদুরের কৌটা।
সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে,
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে ;
শাশুড়ি না বলে যেন 'কী বেহায়া বৌটা' ॥

'পাক-প্রণালী'র মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত ব'লে দাবি নাহি করে মুচিটা ;
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন ॥

যা-ই কেন বলুক-না প্রতিবেশী নিন্দুক
খুব ক'ষে আঁটা যেন থাকে তব সিন্দুক।
বন্ধুরা ধার চায়, দাম চায় দোকানি,
চাকর-বাকর চায় মাসহারা-চোকানি—
ত্রিভুবনে এই আছে অতি বড়ো তিন দুখ ॥

বই-কেনা শখটারে দিয়ো নাকো প্রশ্রয় ;
ধার নিয়ে ফিরিয়ো না, তাতে নাহি দোষ রয় ।
বোঝ আর না-ই বোঝ কাছে রেখো গীতা-টি,
মাঝে মাঝে উলটিয়ো মনুসংহিতাটি ;
'স্ত্রী স্বামীর ছায়াসম' মনে যেন হোঁশ রয় ॥

যদি কোনো শুভদিনে ভর্তা না ভর্ৎসে,
বেশি ব্যয় হয়ে পড়ে পাকা রুই মৎস্যে,
কালিয়ার সৌরভে প্রাণ যবে উতলায়,
ভোজনে দুজনে শুধু বসিবে কি দু'তলায় ।
লোভী এ কবির নাম মনে রেখো, বৎসে ॥

দ্রুত উন্নতিবেগে স্বামীর অদৃষ্ট
দারোগাগিরিতে এসে শেষে পাক্ ইষ্ট ।
বহু পুণ্যের ফল যদি তার থাকে রে,
রায়বাহাদুর-খ্যাতি পাবে তবে আখেরে ;
তার পরে আরো কী বা রবে অবশিষ্ট ॥

প্রয়াগ
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫
[২৭ মাঘ ১৩৪১]

ভাইদ্বিতীয়া

সকলের শেষ ভাই
  সাতভাই চম্পার
পথ চেয়ে বসেছিল
  দৈবানুকম্পার।
মনে মনে বিধি-সনে
  করেছিল মন্ত্রণ,
যেন ভাইদ্বিতীয়ায়
  পায় সে নিমন্ত্রণ।
যদি জোটে দরদি
ছোটো-দি বা বড়ো-দি
অথবা মধুরা কেউ
  নাতনির rank-এ
উঠিবে আনন্দিয়া,
দেহ প্রাণ মন দিয়া
ভাগ্যেরে বন্দিবে
  সাধুবাদে thank-এ॥

ভাইদ্বিতীয়া

এল তিথি দ্বিতীয়া,
ভাই গেল জিতিয়া,
ধরিল পারুল দিদি
হাতা বেড়ি খুন্তি।
নিরামিষে আমিষে
রেঁধে গেল ঘামি সে,
ঝুড়ি ভ'রে জমা হল
ভোজ্য অগুন্তি।
বড়ো থালা কাংস্যের
মৎস্য ও মাংসের
কানায় কানায় বোঝা
হয়ে গেল পূর্ণ।
সুঘ্রাণ পোলায়ে
প্রাণ দিল দোলায়ে,
লোভের প্রবল স্রোতে
লেগে গেল ঘুর্ণো।
জমে গেল জনতা,
মহা তার ঘনতা,
ভাই-ভাগ্যের সবে
হতে চায় অংশী।

নিদারুণ সংশয়
মনটারে দংশয়—
বহুভাগে দেয় পাছে
মোর ভাগ ধ্বংসি।
চোখ রেখে ঘণ্টে
অতি মিঠে কণ্ঠে
কেহ বলে, "দিদি মোর!"
কেহ বলে, "বোন গো,
দেশেতে না থাক্ যশ,
কলমে না থাক্ রস,
রসনা তো রস বোঝে,
করিয়ো স্মরণ গো।"
দিদিটির হাস্য
করিল যা ভাষ্য
পক্ষপাতের তাহে
দেখা দিল লক্ষণ।
ভয় হল মিথ্যে,
আশা হল চিত্তে,
নির্ভাবনায় ব'সে
করিলাম ভক্ষণ॥

ভাইদ্বিতীয়া

লিখেছিনু কবিতা
সুরে তালে শোভিতা—
এই দেশ সেরা দেশ
বাঁচতে ও মরতে।
ভেবেছিনু তখুনি,
একি মিছে বকুনি।
আজ তার মর্মটা
পেরেছি যে ধরতে।
যদি জন্মান্তরে
এ দেশেই টান ধরে
ভাইরূপে আর বার
আনে যেন দৈব—
হাঁড়ি হাঁড়ি রন্ধন,
ঘষাঘষি চন্দন,
ভগ্নী হবার দায়
নৈবচ নৈব।
আসি যদি ভাই হয়ে
যা রয়েছি তাই হয়ে
সোরগোল পড়ে যাবে
হুলু আর শঙ্খে—
জুটে যাবে বুড়িরা
পিসি মাসি খুড়িরা,

খুতি আর সন্দেশ
দেবে লোকজনকে।
বোনটার ধ'রে চুল
টেনে তার দেব ভুল,
খেলার পুতুল তার
পায়ে দেব দলিয়া।
শোক তার কে থামায়,
চুমো দেবে মা আমায়,
রাক্ষুসি বলে তার
কান দেবে মলিয়া।
বড়ো হলে নেব তার
পদখানি দেবতার,
দাদা নাম বলতেই
আঁখি হবে সিক্ত।
ভাইটি অমূল্য,
নাই তার তুল্য,
সংসারে বোনটি
নেহাত অতিরিক্ত॥

ভাইদ্বিতীয়া
১৩৪৩

ভোজনবীর

অসংকোচে করিবে ক'ষে ভোজনরসভোগ,
সাবধানতা সেটা যে মহারোগ।
যকৃৎ যদি বিকৃত হয়
স্বীকৃত রবে, কিসের ভয়,
নাহয় হবে পেটের গোলযোগ॥

কাপুরুষেরা করিস তোরা দুখভোগের ডর,
সুখভোগের হারাস অবসর।
জীবন মিছে দীর্ঘ করা
বিলম্বিত মরণে মরা
শুধুই বাঁচা না খেয়ে ক্ষীর সর॥

দেহের তামসিকতা ছিছি মাংস হাড় পেশি,
তাহারি 'পরে দরদ এত বেশি।
আত্মা জানে রসের রুচি,
কামনা করে কোফ্‌তা লুচি,
তারেও হেলা বলো তো কোন্ দেশী॥

ওজন করি ভোজন করা, তাহারে করি ঘৃণা,
মরণভীরু, এ কথা বুঝিবি না।
রোগে মরার ভাবনা নিয়ে
সাবধানীরা রহে কি জিয়ে—
কেহ কি কভু মরে না রোগ বিনা॥

মাথা ধরায় মাথার শিরা হোক-না ঝংকৃত,
পেটের নাড়ি ব্যথায় টংকৃত।
ওডিকলোনে ললাট ভিজে—
মাদুলি আর তাগা-তাবিজে
সারাটা দেহ হবে অলংকৃত

যখন আধিভৌতিকের বাজিবে শেষ ঘড়ি,
গলায় যমদৌতিকের দড়ি।
হোমিয়োপ্যাথি বিমুখ যবে,
কবিরাজিও নারাজ হবে,
তখন আবধৌতিকের বড়ি॥

তাহার পরে ছেলে তো আছে বাপেরই পথে ঢুকে
অম্লশূলসাধনকৌতুকে।
কাঁচা আমের আচার যত
রহিবে হয়ে বংশগত,
ধরাবে জ্বালা পারিবারিক বুকে॥

খাওয়া বাঁচায়ে বাঙালিদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক
এ দেশে তবে ধরিত না তো লোক।
অপরিপাকে মরণভয়
গৌড়জনে করেছে জয়,
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক॥

লঙ্কা আনো, সর্ষে আনো, সস্তা আনো ঘৃত,
গন্ধে তার হোয়ো না শঙ্কিত।
আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধো,
ঘণ্ট আর ছেঁচকি রাঁধো,
বৈদ্য ডাকো— তাহার পরে মৃত

[মাঘ-ফাল্গুন ১৩৩৮]

অপাক-বিপাক

চলতি ভাষায় যারে ব'লে থাকে আমাশা
যত দূর জানা আছে, সেটা নয় তামাশা।
অধ্যাপকের পেটে এল সেই রোগটা তো,
তাহার কারণ ছিল গুরু জলযোগটা তো॥

বউমার অবারিত অতিথিসেবার চোটে
কী কাণ্ড ঘটেছিল শুনে বুক ফুলে ওঠে।
টেবিল জুড়িয়া ছিল চর্ব্য ও কত পেয় ;
ডেকে ডেকে বলেছেন, "যত পারো তত খেয়ো।"
হায়, এত উদারতা সইল না উদরের—
জঠরে কী কঠোরতা বিজ্ঞানভূধরের ;
রসনায় ভূরি ভূরি পেল এত মিষ্টতা,
অন্তরে নিয়ে তারে করিল না শিষ্টতা।
এই যদি আচরণ হেন খ্যাতনামাদের,
তোমাদেরি লজ্জা সে, ক্ষতি নেই আমাদের।
হেথাকার আয়োজনে নাই কার্পণ্য যে,
প্রবল প্রমাণে তারি পরিবার ধন্য যে।
বিশ্বে ছড়ালো খ্যাতি ; বিশ্ববিদ্যাগৃহে
করে সবে কানাকানি, "বলো দেখি, হল কী হে।"
এত বড়ো রটনার কারণ ঘটান যিনি
তাঁর কাছে কবি রবি চিরদিন রবে ঋণী॥

৫ বৈশাখ ১৩৪১

গর্‌-ঠিকানি

বেঠিকানা তব
  আলাপ শব্দভেদী
দিল এ বিজনে
  আমার মৌন ছেদি।
দাদুর পদবী
  পেয়েছি, তাহার দায়
কোনো ছুতো করে
  কভু কি ঠেকানো যায়।
স্পর্ধা করিয়া
  ছন্দে লিখেছ চিঠি ;
ছন্দেই তার
  জবাবটা যাক মিটি।
নিশ্চিত তুমি
  জানিতে মনের মধ্যে—
গর্ব আমার
  খর্ব হবে না গদ্যে।
লেখনীটা ছিল
  শক্ত জাতেরই ঘোড়া ;
বয়সের দোষে
  কিছু তো হয়েছে খোঁড়া।

তোমাদের কাছে

সেই লজ্জাটা ঢেকে

মনে সাধ, যেন

যেতে পারি মান রেখে।

তোমার কলম

চলে যে হালকা চালে,

আমারো কলম

চালাব সে ঝাঁপতালে ;

হাঁপ ধরে, তবু

এই সংকল্পটা

টেনে রাখি, পাছে

দাও বয়সের খোঁটা।

ভিতরে ভিতরে

তবু জাগ্রত রয়

দর্পহরণ

মধুসূদনের ভয়।

বয়স হলেই

বৃদ্ধ হয়ে যে মরে

বড়ো ঘৃণা মোর

সেই অভাগার 'পরে।

প্রাণ বেরোলেও

তোমাদের কাছে তবু

তাই তো ক্লান্তি
প্রকাশ করি নে কভু

কিন্তু একটা
কথায় লেগেছে ধোঁকা,
কবি বলেই কি
আমারে পেয়েছ বোকা।
নানা উৎপাত
করে বটে নানা লোকে,
সহ্য তো করি
পষ্ট দেখেছ চোখে—
সেই কারণেই
তুমি থাকো দূরে দূরে,
বলেছ সে কথা
অতি সকরুণ সুরে।
বেশ জানি, তুমি
জানো এটা নিশ্চয়—
উৎপাত সে যে
নানা রকমের হয়।
কবিদের 'পরে
দয়া করেছেন বিধি—

মিষ্টি মুখের
উৎপাত আনে দিদি।
চাটু বচনের
মিষ্টি রচন জানে ;
ক্ষীরে সরে কেউ
মিষ্টি বানিয়ে আনে।
কোকিলকণ্ঠে
কেউ বা কলহ করে ;
কেউ বা ভোলায়
গানের তানের স্বরে।
তাই ভাবি, বিধি
যদি দরদের ভুলে
এ উৎপাতের
বরাদ্দ দেন তুলে,
শুকনো প্রাণটা
মহা উৎপাত হবে।
উপমা লাগিয়ে
কথাটা বোঝাই তবে।—
সামনে দেখো-না
পাহাড়, শাবল ঠুকে
ইলেক্‌ট্রিকের
খোঁটা পোঁতে তার বুকে ;

গন্ধ-ঠিকানি

সন্ধেবেলার
মস্থণ অন্ধকারে
এখানে সেখানে
চোখে আলো খোঁচা মারে।
তা দেখে চাঁদের
ব্যথা যদি লাগে প্রাণে,
বার্তা পাঠায়
শৈলশিখর-পানে—
বলে, "আজ হতে
জ্যোৎস্নার উৎপাতে
আলোর আঘাত
লাগাব না আর রাতে"—
ভেবে দেখো, তবে
কথাটা কি হবে ভালো।
তাপের জ্বলনে
সবারই কি আছে আলো?

এখানেই চিঠি
শেষ ক'রে যাই চলে—
ভেবো না যে তাহা
শক্তি কমেছে ব'লে ;

বুদ্ধি বেড়েছে
তাহারই প্রমাণ এটা ;
বুঝেছি, বেদম
বাণীর হাতুড়ি পেটা
কথারে চওড়া
করে বকুনির জোরে,
তেমনি যে তাকে
দেয় চ্যাপটাও ক'রে।
বেশি যাহা তাই
কম, এ কথাটা মানি—
চেঁচিয়ে বলার
চেয়ে ভালো কানাকানি
বাঙালি এ কথা
জানে না ব'লেই ঠকে ;
দাম যায় আর
দম যায় যত বকে।
চেঁচানির চোটে
তাই বাংলার হাওয়া
রাতদিন যেন
হিস্‌টিরিয়ায় পাওয়া।
তারে বলে আর্ট
না-বলা যাহার কথা ;

গর-ঠিকানি

ঢাকা খুলে বলা
সে কেবল বাচালতা।
এই তো দেখো-না
নাম-ঢাকা তব নাম ;
নামজাদা খ্যাতি
ছাপিয়ে যে ওর দাম।

এই দেখো দেখি,
ভারতীর ছল কী এ।
বকা ভালো নয়,
এ কথা বোঝাতে গিয়ে
খাতাখানা জুড়ে
বকুনি যা হল জমা
আর্টের দেবী
করিবে কি তারে ক্ষমা।
সত্য কথাটা
উচিত কবুল করা—
রব যে উঠেছে
রবিরে ধরেছে জরা,
তারই প্রতিবাদ
করি এই তাল ঠুকে ;

তাই ব'কে যাই

যত কথা আসে মুখে।

এ যেন কলপ

চুলে লাগাবার কাজ—

ভিতরেতে পাকা

বাহিরে কাঁচার সাজ।

ক্ষীণ কণ্ঠেতে

জোর দিয়ে তাই দেখাই,

বকবে কি শুধু

নাতনিজনেরা একাই।

মানব না হার

কোনো মুখরার কাছে,

সেই গুমোরের

আজো ঢের বাকি আছে॥

কালিম্পং

৬ আষাঢ় ১৩৪৫

অনাদৃতা লেখনী

সম্পাদকি তাগিদ নিত্য চলছে বাহিরে,
অন্তরেতে লেখার তাগিদ একটু নাহি রে
মৌন মনের মধ্যে
গদ্যে কিংবা পদ্যে।
পূর্ব যুগে অশোক গাছে নারীর চরণ লেগে
ফুল উঠিত জেগে—
কলিযুগে লেখনীরে সম্পাদকের তাড়া
নিত্যই দেয় নাড়া,
ধাক্কা খেয়ে যে জিনিসটা ফোটে খাতার পাতে
তুলনা কি হয় কভু তার অশোকফুলের সাথে।

দিনের পরে দিন কেটে যায়
গুন্‌গুনিয়ে গেয়ে
শীতের রৌদ্রে মাঠের পানে চেয়ে।
ফিকে রঙের নীল আকাশে
আতপ্ত সমীরে
আমার ভাবের বাষ্প উঠে
ভেসে বেড়ায় ধীরে,

প্রহাসিনী

মনের কোণে রচে মেঘের স্তূপ,
নাই কোনো তার রূপ—
মিলিয়ে যায় সে এলোমেলো নানান ভাবনাতে,
মিলিয়ে যায় সে কুয়োর ধারে
সজনেগুচ্ছ-সাথে ॥

এদিকে যে লেখনী মোর একলা বিরহিণী ;
দৈবে যদি কবি হতেন তিনি,
বিরহ তাঁর পদ্যে বানিয়ে
নিচের লেখার ছাঁদে আমায় দিতেন জানিয়ে—

বিনয়সহ এই নিবেদন অঙ্গুলিচম্পাসু,
নালিশ জানাই কবির কাছে, জবাবটা চাই আশু।
যে লেখনী তোমার হাতের স্পর্শে জীবন লভে
অচলকূটের নির্বাসন সে কেমন ক'রে সবে।
বক্ষ আমার শুকিয়ে এল, বন্ধ মসী-পান,
কেন আমায় ব্যর্থতার এই কঠিন শাস্তি দান।
স্বাধিকারে প্রমত্তা কি ছিলাম কোনোদিন।
করেছি কি চঞ্চু আমার ভোঁতা কিংবা ক্ষীণ।
কোনোদিন কি অপঘাতে তাপে কিংবা চাপে
অপরাধী হয়েছিলাম মসীপাতন-পাপে।

অনাদৃতা লেখনী

পত্রপটে অক্ষর-রূপ নেবে তোমার ভাষা,
দিনে-রাতে এই ছাড়া মোর আর কিছু নেই আশা।
নীলকণ্ঠ হয়েছি যে তোমার সেবার তরে,
নীল কালিমার তীব্ররসে কণ্ঠ আমার ভরে।
চালাই তোমার কীর্তিপথে রেখার পরে রেখা,
আমার নামটা কোনো খাতায় কোথাও রয় না লেখা।
ভগীরথকে দেশবিদেশে নিয়েছে লোক চিনে,
গোমুখী সে রইল নীরব খ্যাতিভাগের দিনে।
কাগজ সেও তোমার হাতের স্বাক্ষরে হয় দামি,
আমার কাজের পুরস্কারে কিছুই পাই নে আমি।
কাগজ নিত্য শুয়ে কাটায় টেবিল-'পরে লুটি,
বাঁ দিক থেকে ডান দিকেতে আমার ছুটোছুটি।
কাগজ তোমার লেখা জমায়, বহে তোমার নাম—
আমার চলায় তোমার গতি এইটুকু মোর দাম।
অকীর্তিত সেবার কাজে অঙ্গ হবে ক্ষীণ,
আসবে তখন আবর্জনায় বিসর্জনের দিন।
বাচালতায় তিন ভুবনে তুমিই নিরুপম,
এ পত্র তার অনুকরণ ; আমায় তুমি ক্ষমো।
নালিশ আমার শেষ করেছি, এখন তবে আসি।
—তোমার কালিদাসী ॥

শান্তিনিকেতন
১৪।১৫ মাঘ ১৩৪৩

পলাতকা

কোথা তুমি গেলে যে মোটরে
শহরের গলির কোটরে,
একজামিনেশনের তাড়া।
কেতাবের পরে ঝুঁকে থাকো,
বেণীর ডগাও দেখি নাকো,
দিনে রাতে পাই নে যে সাড়া।
আমার চায়ের সভা শূন্য,
মনটা নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ,
সুমুখে নফর বনমালী।
'সুমুখ' তাহারে বলা মিছে,
মুখ দেখে মন যায় খিঁচে,
বিনা দোষে দিই তারে গালি।
ভোজন ওজনে অতি কম—
নাই রুটি, নাই আলুদম,
নাই রুইমাছের কালিয়া।
জঠর ভরাই শুধু দিয়ে
দু-পেয়ালা Chinese-tea-য়ে
আধসের দুগ্ধ ঢালিয়া।

পলাতকা

উদাস হৃদয়ে খাই একা
টিনের মাখন দিয়ে সেঁকা
রুটি-তোস্ শুধু খান-তিন।
গোটা-দুই কলা খাই গুনে,
তারই সাথে বিলিতি-বেগুনে
কিছু পাওয়া যায় ভিটামিন।
মাঝে মাঝে পাই পুলিপিঠে,
পার করে দিই দু-চারিটে,
খেজুরগুড়ের সাথে মেখে।
পিরিচে পেরাকি যবে আনে
আড়চোখে চেয়ে তার পানে
'পরে খাব' বলে দিই রেখে।
তারপর দুপুর অবধি
না ক্ষীর, না ছানা সর দধি,
ছুঁই নেকো কোফতা কাবাব।
নিজের এ দশা ভেবে ভেবে
বুক যায় সাত হাত নেবে,
কারে বা জানাই মনোভাব।
করছি নে exaggerate—
কিছু আছে সত্য নিরেট,
কবিত্ব সেও অল্প না।

বিরহ যে বুকে ব্যথা দাগে
সাজিয়ে বলতে গেলে লাগে
　　　　পনেরো আনাই কল্পনা।
অতএব এই চিঠি-পাঠে
পরান তোমার যদি ফাটে
　　　　খুব বেশি রবে না প্রমাণ।
চিঠির জবাব দেবে যবে
ভাষা ভরে দিয়ো হাহারবে
　　　　কবি-নাতনির রেখো মান ॥

পুনশ্চ

বাড়িয়ে বলাটা ভালো নয়
যদি কোনো নীতিবাদী কয়
　　　　কোস্ তারে, "অতিশয় উক্তি—
মসলার যোগে যথা রান্না,
আবদারে ছল ক'রে কান্না,
　　　　নাকিসুর-যোগে যথা যুক্তি।
ঝুমকোর ফুল ফোটে ডালে,
চোরেও চায় না কোনোকালে,
　　　　কানে ঝুমকোর ফুল দামি।

কৃত্রিম জিনিসেরই দাম,
কৃত্রিম উপাধিতে নাম
জমকালো করেছি তো আমি।”
অতএব মনে রেখো দড়ো,
এ চিঠির দাম খুব বড়ো,
যে হেতুক বাড়িয়ে বলায়
বাজারে তুলনা এর নেই—
কেবলই বানানো বচনেই
ভরা এ যে ছলায় কলায়।
পাল্লা যে দিবি মোর সাথে
সে ক্ষমতা নেই তোর হাতে,
তবুও বলিস প্রাণপণ
বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিঠে কথা—
ভুলিবে, হবে না অন্যথা,
দাদামশায়ের বোকা মন।
যা হোক, এ কথা চাই শোনা,
তাড়াতাড়ি ছন্দে লিখো না,
নাহয় না হলে কবিবর—
অনুকরণের শরাহত
আছি আমি ভীষ্মের মতো,
তাহে তুমি বাড়িয়ো না স্বর।

যে ভাষায় কথা কয়ে থাক
আদর্শ তারে বলে নাকো,
আমার পক্ষে সে তো ঢের—
Flatter করিতে যদি পার
গ্রাম্যতাদোষ যত তারও
একটু পাব না আমি টের॥

শান্তিনিকেতন
৮ মাঘ ১৩৪১

কাপুরুষ

নিবেদনম্ অধ্যাপকিনিস্থ,—

কর্তা তোমার নিতান্ত নন শিশু,
জানিয়ো তো সেই সংখ্যাতত্ত্বনিধিকে,
ব্যর্থ যদি করেন তিনি বিধিকে,
পুরুষজাতির মুখ্যবিজয়কেতু
গুল্ফশ্মশ্রু ত্যজেন বিনা হেতু,
গণ্ডদেশে পাবেন ক্ষুরের শাস্তি
একটুমাত্র সংশয় তায় নাস্তি।
সিংহ যদি কেশর আপন মুড়োয়
সিংহী তারে হেসেই তবে উড়োয়।
কৃষ্ণসার সে বদ্‌খেয়ালে হঠাৎ
শিং-জোড়াটা কাটে যদি পটাৎ
কৃষ্ণসার্‌নি সইতে সে কি পারবে—
ছী ছি ব'লে কোন্ দেশে দৌড় মারবে।
উলটো দেখি অধ্যাপকের বেলায়—
গোঁফদাড়ি সে অসংকোচে ফেলায়,
কামানো মুখ দেখেন যখন ঘরনি
বলেন না তো 'দ্বিধা হও মা ধরণী' ॥

১৮।১১।৩৭

[২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৪]

গৌড়ী রীতি

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই,
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে মহারাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি ॥

বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বিড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে নয়নের জলে,
"দাতা বটে ষোলো আনা।"

বিপুল ভোজনে মণের ওজনে
ছটাক যদি বা কমে
সেই ছটাকের চাঁটিতে ঢাকের
গালাগালি-বোল জমে ॥

দেনার হিসাবে ফাঁকিই মিশাবে,
খুঁজিয়া না পাবে চাবি—
পাওনা-যাচাই কঠিন বাছাই,
শেষ নাহি তার দাবি ॥

গৌড়ী রীতি

রুদ্ধ দুয়ার বহুমান তার
দ্বারীর প্রসাদে খোলে।
মুক্ত ঘরের মহা আদরের
মূল্য সবাই ভোলে॥

সামনে আসিয়া নম্র হাসিয়া
স্তবের রবের দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দারোপণ—
ধন্য ধন্য গৌড়॥

প্র. বৈশাখ ১৩৩৯

প্র. সাময়িক পত্রে প্রচার

অটোগ্রাফ

খুলে আজ বলি, ওগো নব্য,
নও তুমি পুরোপুরি সভ্য।
জগৎটা যত লও চিনে
ভদ্র হতেছ দিনে দিনে।
বলি তবু সত্য এ কথা—
বারো আনা অভদ্রতা
কাপড়ে-চোপড়ে ঢাক' তারে,
ধরা তবু পড়ে বারে বারে,
কথা যেই বার হয় মুখে
সন্দেহ যায় সেই চুকে॥

ডেস্কেতে দেখিলাম, মাতা
রেখেছেন অটোগ্রাফ-খাতা।
আধুনিক রীতিটার ভানে
যেন সে তোমারই দাবি আনে।
এ ঠকানো তোমার যে নয়
মনে মোর নাই সংশয়।
সংসারে যারে বলে নাম
তার যে একটু নেই দাম

অটোগ্রাফ

সে কথা কি কিছু ঢাকা আছে
শিশু ফিলজফারের কাছে।
খোকা বলে, বোকা বলে কেউ—
তা নিয়ে কাঁদ না ভেউ-ভেউ।
নাম-ভোলা খুশি নিয়ে আছ,
নামের আদর নাহি যাচ।
খাতাখানা মন্দ এ না গো
পাতা-ছেঁড়া কাজে যদি লাগ।
আমার নামের অক্ষর
চোখে তব দেবে ঠোক্কর।
ভাববে, এ বুড়োটার খেলা,
আঁচড়-পাঁচড় কাটে মেলা।
লজঞ্জুসের যত মূল্য
নাম মোর নহে তার তুল্য।
তাই তো নিজেরে বলি, ধিক্,
তোমারই হিসাব-জ্ঞান ঠিক।
বস্তু-অবস্তুর সেন্স্
খাঁটি তব, তার ডিফারেন্স্
পষ্ট তোমার কাছে খুবই—
তাই, হে লজঞ্জুস-লুভি,

মতলব করি মনে মনে,
খাতা থাক্ টেবিলের কোণে ;
বনমালী কো-অপেতে গেলে
টফি-চকোলেট যদি মেলে
কোনোমতে তবে অন্তত
মান রবে আজকের মতো
ছ বছর পরে নিয়ো খাতা,
পোকায় না কাটে যদি পাতা ॥

শান্তিনিকেতন
১ পৌষ ১৩৪৫

মাল্যতত্ত্ব

লাইব্রেরিঘর, টেবিল-ল্যাম্পো জ্বালা,—
লেগেছি প্রুফ-করেক্‌শনে গলায় কুন্দমালা।
ডেস্কে আছে দুই পা তোলা, বিজন ঘরে একা,
এমন সময় নাতনি দিলেন দেখা॥

সোনার কাঠির শিহর-লাগা বিশবছরের বেগে
আছেন কন্যা দেহে মনে পরিপূর্ণ জেগে।
হঠাৎ পাশে আসি
কটাক্ষেতে ছিটিয়ে দিল হাসি,
বললে বাঁকা পরিহাসের ছলে
"কোন্ সোহাগির বরণমালা পরেছ আজ গলে।"
একটু থেমে দ্বিধার ভানে নামিয়ে দিয়ে চোখ
বলে দিলেম, "যেই বা সে-জন হোক
বলব না তার নাম—
কী জানি, ভাই, কী হয় পরিণাম।
মানবধর্ম, ঈর্ষা বড়ো বালাই,
একটুতে বুক জ্বালায়।"

বললে শুনে বিংশতিকা, "এই ছিল মোর ভালে—
বুক ফেটে আজ মরব কি শেষকালে,
কে কোথাকার তার উদ্দেশে করব রাগারাগি
মালা দেওয়ার ভাগ নিয়ে কি— এম্‌নি হতভাগি।"
আমি বললেম, "কেনই বা দাও লাজ,
করোই-না আন্দাজ।"
বলে উঠল, "জানি জানি, ঐ আমাদের ছবি,
আমারই বান্ধবী।
একসঙ্গে পাস করেছি ব্রাহ্ম-গার্‌ল্‌-স্কুলে,
তোমার নামে চোখ পড়ে তার ঢুলে।
তোমারও তো দেখেছি ওর পানে
মুগ্ধ আঁখি পক্ষপাতের কটাক্ষসন্ধানে।"
আমি বললেম, "নাম যদি তার শুনবে নিতান্তই—
আমাদের ঐ জগা মালী, মৃদুস্বরে কই।"
নাতনি বলে, "হায় কী দুরবস্থা,
বয়স হয়ে গেছে ব'লেই কণ্ঠ এতই সস্তা।
যে গলাটায় আমরা গলগ্রহ
জগামালীর মালা সেথায় কোন্‌ লজ্জায় বহ।"
আমি বললেম, "সত্য কথাই বলি,
তরুণীদের করুণা সব দিলেম জলাঞ্জলি।
নেশার দিনের পারে এসে আজকে লাগে ভালো,
ঐ যে কঠিন কালো।

মাল্যতত্ত্ব

জগার আঙুল মালা যখন গাঁথে
বোকা মনের একটা কিছু মেশায় তারই সাথে।
তারই পরশ আমার দেহ পরশ করে যবে
রস কিছু তার পাই যে অনুভবে।
এ-সব কথা বলতে মানি ভয়
তোমার মতো নব্যজনের পাছে মনে হয়—
এ বাণী বস্তুত
কেবলমাত্র উচ্চদরের উপদেশের ছুতো,
ডাইডাক্‌টিক্‌ আখ্যা দিয়ে যারে
নিন্দা করে নতুন অলংকারে।
গা ছুঁয়ে তোর কই,
কবিই আমি, উপদেষ্টা নই।
বলি-পড়া বাকলওয়ালা বিদেশী ঐ গাছে
গন্ধবিহীন মুকুল ধরে আছে
আঁকাবাঁকা ডালের ডগা ধূসর রঙে ছেয়ে—
যদি বলি ওটাই ভালো মাধবিকার চেয়ে,
দোহাই তোমার কুরঙ্গনয়নী,
ব্যঙ্গকুটিল-দুর্বাক্য-চয়নী,
ভেবো না গো, পূর্ণচন্দ্রমুখী,
হরিজনের প্রপাগ্যাণ্ডা দিচ্ছে বুঝি উঁকি।
এতদিন তো ছন্দে-বাঁধা অনেক কলরবে
অনেকরকম রঙ-চড়ানো স্তবে

সুন্দরীদের জুগিয়ে এলেম মান—
আজকে যদি বলি 'আমার প্রাণ
জগামালীর মালায় পেল একটা কিছু খাঁটি',
তাই নিয়ে কি চলবে ঝগড়াঝাঁটি।"
নাতনি কহেন, "ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছ কথা,
আমার মনে সত্যি লাগায় ব্যথা।
তোমার বয়স চারি দিকের বয়সখানা হতে
চলে গেছে অনেক দূরের স্রোতে।
একলা কাটাও ঝাপসা দিবসরাতি,
নাইকো তোমার আপন দরের সাথি।
জগামালীর মালাটা তাই আনে
বর্তমানের অবজ্ঞাভার নীরস অসম্মানে।"
আম বললেম, "দয়াময়ী, ঐটে তোমার ভুল,
ঐ কথাটার নাইকো কোনো মূল।
জান তুমি, ঐ যে কালো মোষ
আমার হাতে রুটি খেয়ে মেনেছে মোর পোষ,
মিনি-বেড়াল নয় বলে সে আছে কি তার দোষ।
জগামালীর প্রাণে
যে জিনিসটা অবুঝভাবে আমার দিকে টানে
কী নাম দেব তার,
একরকমের সেও অভিসার।

কিন্তু সেটা কাব্যকলায় হয় নি বরণীয়,
সেই কারণেই কণ্ঠে আমার সমাদরণীয়।"
নাতনি হেসে বলে,
"কাব্যকথার ছলে
পকেট থেকে বেরোয় তোমার ভালো কথার থলি,
ওটাই আমি অভ্যাসদোষ বলি।"
আমি বললেম, "যদি কোনোক্রমে
জন্মগ্রহের ভ্রমে
ভালো যেটা সেটাই আমার ভালো লাগে দৈবে,
হয়তো সেটা একালেরও সরস্বতীর সইবে।"
নাতনি বলে, "সত্যি বলো দেখি,
আজকে-দিনের এই ব্যাপারটা কবিতায় লিখবে কি।"
আমি বললেম, "নিশ্চয় লিখবই,
আরম্ভ তার হয়েই গেছে সত্য করেই কই।
বাঁকিয়ো না গো পুষ্পধনুক-ভুরু,
শোনো তবে, এইমতো তার শুরু।—
'শুক্ল একাদশীর রাতে
কলিকাতার ছাতে
জ্যোৎস্না যেন পারিজাতের পাপড়ি দিয়ে ছোঁওয়া,
গলায় আমার কুন্দমালা গোলাপজলে ধোওয়া'—
এইটুকু যেই লিখেছি সেই হঠাৎ মনে প'ল,
এটা নেহাত অসাময়িক হল।

হাল ফ্যাশানের বাণীর সঙ্গে নতুন হল রফা,
একাদশীর চন্দ্র দেবেন কর্মেতে ইস্তফা।
শূন্যসভায় যত খুশি করুন বাবুয়ানা,
সত্য হতে চান যদি তো বাহার-দেওয়া মানা।
তা ছাড়া ঐ পারিজাতের ন্যাকামিও ত্যাজ্য,
মধুর করে বানিয়ে বলা নয় কিছুতেই ন্যায্য।
বদল করে হল শেষে নিম্নরকম ভাষা—
'আকাশ সেদিন ধুলোয় ধোঁয়ায় নিরেট করে ঠাসা,
রাতটা যেন কুলিমাগি কয়লাখনি থেকে
এল কালো রঙের উপর কালির প্রলেপ মেখে।'
তার পরেকার বর্ণনা এই— 'তামাক-সাজার ধন্দে
জগার থ্যাবড়া আঙুলগুলো দোক্তাপাতার গন্ধে
দিনরাত্রি ল্যাপা।
তাই সে জগা খ্যাপা
যে মালাটাই গাঁথে তাতে ছাপিয়ে ফুলের বাস
তামাকেরই গন্ধের হয় উৎকট প্রকাশ।' ”
নাতনি বললে বাধা দিয়ে, “আমি জানি জানি,
কী বলে যে শেষ করেছ নিলেম অনুমানি।
যে তামাকের গন্ধ ছাড়ে মালার মধ্যে, ওটায়
সর্বসাধারণের গন্ধ নাড়ীর ভিতর ছোটায়।
বিশ্বপ্রেমিক, তাই তোমার এই তত্ত্ব—
ফুলের গন্ধ আলংকারিক, এ গন্ধটাই সত্য।”

আমি বললেম, "ওগো কন্যে, গলদ আছে মূলেই,
এতক্ষণ যা তর্ক করছি সেই কথাটা ভুলেই।
মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, সরস্বতীর গলে
আর কি ওটা চলে।
রিয়ালিস্‌টিক প্রসাধন যা নব্যশাস্ত্রে পড়ি—
সেটা গলায় দড়ি।"

নাতনি আমার ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে
এক দৌড়ে চলে গেল আমার আশা ছেড়ে॥

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৮
[১৫ পৌষ ১৩৪৫]

সংযোজন

নাসিক হইতে

খুড়ার পত্র

কলকত্তামে চলা গয়ো রে [2]সুরেন বাবু মেরা—
সুরেন বাবু আসল বাবু, সকল বাবুকো সেরা।
খুড়া সাবকো কায়কো নহি পতিয়া ভেজো বাচ্ছা—
মহিনা-ভর্ কুছ খবর মিলে না ইয়ে তো নহি আচ্ছা।
টপাল[1] টপাল কঁহা টপাল রে, কপাল হমারা মন্দ—
সকাল বেলাতে নাহি মিলতা টপালকো নাম-গন্ধ।
ঘরকো যাকে কায়কো, বাবা, তুম্‌সে হম্‌সে ফর্‌খৎ।
দো-চার কলম লীখ দেওঙ্গে ইস্‌মে ক্যা হয় হর্‌কৎ!
প্রবাসকো এক সীমা-পর হম বৈঠ্‌কে আছি একলা—
[4]সুরি বাবাকো বাস্তে আঁখ্‌সে বহুৎ পানি নেক্‌লা।
সর্বদা মন কেমন কর্‌তা, কেঁদে উঠ্‌তা হির্দয়—
ভাত খাতা, ইস্কুল যাতা সুরেনবাবু নির্দয়।
মন্‌কা দুঃখে হূহু কর্‌কে নিক্‌লে হিন্দুস্থানি—
অসম্পূর্ণ ঠেক্‌তা কানে বাঙ্গলাকো জবানি।
মেরা উপর জুলুম কর্‌তা তেরি [3]বহিন বাই—
কী করেঙ্গা কোথায় যাঙ্গা ভেবে নাহি পাই।
বহুৎ জোর্‌সে গাল টিপ্‌তা দোনো আঙ্গ্‌লি দেকে,
বিলাতী এক পৈনি বাজ্‌না বাজাতা থেকে থেকে,

কভী কভী নিকট আকে ঠোঁঠমে চিম্‌টি কাটতা,
কাঁচি লে কর্‌ কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলো সব ছাঁটতা—
জজ সাহেব কুছ বোল্‌তা নহি, রক্ষা করবে কেটা!
কঁহা গয়ো রে কঁহা গয়োরে জজ সাহেবকি বেটা—
গাড়ি চড়্‌কে লাঠিন পড়্‌কে তুম্‌ তো যাতা ইস্কিল—
ঠোঁটে নাকে চিম্‌টি খাকে হমারা বহুৎ মুশকিল।
এদিকে আবার পার্টি হোতা, খেল্‌নেকোবি যাতা—
জিম্‌খানামে হিম্‌সিম্‌ এবং থোড়া বিস্কুট খাতা।
তুম ছাড়া কোই সম্‌জে না তো হম্‌রা দুরাবস্থা—
বহিন তেরি বহুৎ merry খিল্‌ খিল্‌ কর্‌কে হাস্‌তা।
চিঠি লিখিও মাকো দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম।
আজকের মতো তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম।

প্র. আশ্বিন ১২৯৩

১ চিঠির ডাক। ২।৩ ‘জজসাহেব’ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ও কন্যা : সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা।

পত্র

স্বষ্টি-প্রলয়ের তত্ত্ব
লয়ে সদা আছ মত্ত,
দৃষ্টি শুধু আকাশে ফিরিছে ;
গ্রহতারকার পথে
যাইতেছ মনোরথে,
ছুটিছ উল্কার পিছে পিছে ;
হাঁকায়ে দু-চারিজোড়া
তাজা পক্ষীরাজ-ঘোড়া
কলপনা গগনভেদিনী
তোমারে করিয়া সঙ্গী
দেশকাল যায় লঙ্ঘি,
কোথা প'ড়ে থাকে এ মেদিনী।
সেই তুমি ব্যোমচারী
আকাশ-রবিরে ছাড়ি
ধরার রবিরে কর মনে—
ছাড়িয়া নক্ষত্র গ্রহ
একি আজ অনুগ্রহ
জ্যোতির্হীন মর্তবাসী জনে।

ভুলেছ ভুলেছ কক্ষ,
দূরবীন ভ্রষ্টলক্ষ্য,
কোথা হতে কোথায় পতন।
ত্যজি দীপ্ত ছায়াপথে
পড়িয়াছ কায়াপথে—
মেদ-মাংস-মজ্জা-নিকেতন॥

বিধি বড়ো অনুকূল,
মাঝে মাঝে হয় ভুল,
ভুল থাক্ জন্ম জন্ম বেঁচে—
তবু তো ক্ষণেক-তরে
ধূলিময় খেলাঘরে
মাঝে মাঝে দেখা দাও কেঁচে
তুমি অদ্য কাশীবাসী,
সম্প্রতি লয়েছ আসি
বাবা ভোলানাথের শরণ;
দিব্য নেশা জমে ওঠে,
দু বেলা প্রসাদ জোটে,
বিধিমতে ধূমোপকরণ।
জেগে উঠে মহানন্দ,
খুলে যায় ছন্দোবন্ধ,
ছুটে যায় পেন্সিল উদ্দাম—

পরিপূর্ণ ভাবভরে
লেফাকা ফাটিয়া পড়ে,
বেড়ে যায় ইস্টাম্পের দাম।
আমার সে কর্ম নাস্তি,
দারুণ দৈবের শাস্তি,
শ্লেষ্মা-দেবী চেপেছেন বক্ষে—
সহজেই দম কম,
তাহে লাগাইলে দম
কিছুতে রবে না আর রক্ষে।
নাহি গান, নাহি বাঁশি,
দিনরাত্রি শুধু কাশি,
ছন্দ তাল কিছু নাহি তাহে;
নবরস কবিত্বের
চিত্তে জমা ছিল ঢের,
বহে গেল সর্দির প্রবাহে।
অতএব নমোনম,
অধম অক্ষমে ক্ষম,
ভঙ্গ আমি দিনু ছন্দরণে—
মগধে কলিঙ্গে গৌড়ে
কল্পনার ঘোড়দৌড়ে
কে বলো পারিবে তোমা-সনে॥

বনক্ষেত্র। শিমলাশৈল
শনিবার [১১ অগ্রহায়ণ ১৩০০]

সালগম-সংবাদ

১নাতিনীর পত্র

শ্রীচরণেষু

দাদামহাশয়

খেয়েছ যে সাল্‌গম   না করিয়া কাল-গম
এই আমি বহুভাগ্য মানি।
তার পরে মিঠি মিঠি   লিখেছ স্নেহের চিঠি,
তার মূল্য কী আছে কী জানি।
তুচ্ছ এই উপহার   কে জানিত কমলার
পদ্মসরোবর দিবে নাড়া—
সালগম মটন রোস্টে   কবির অধর-ওষ্ঠে
খুলি দিবে কাব্যের ফোয়ারা।
কিন্তু বড়দাদা-ভাই   বড়ো মনে দুঃখ পাই
এ খেদ যাবে না প্রাণ গেলে—
শুনিতে হইল এও   ভাগ্যমান তোমারেও
নাচের দোসর নাহি মেলে!
নাহয় না হল বুড়ি   তবুও তো ঝুড়ি-ঝুড়ি
নাতিনীতে ঘরটি বোঝাই—
যারেই লইবে বাছি   সেই তো উঠিবে নাচি,
নাচিবার ভাবনা তো নাই।

এ কথা ভুলিলে যবে বুঝায়ে কী আর হবে—
ধিক্ তবে মোর সালগমে।
বুঝিলাম তরকারী যত হোক দরকারী,
তাহাতে কবিত্ব নাহি জমে।
আর না করিব ভুল— এবারে বসন্তে ফুল
তুলিয়া আনিব ভরি ডালা।
সালগম পেঁয়াজকলি জলে দিয়া জলাঞ্জলি
পাঠাইব বকুলের মালা।

প্র. ভাদ্র ১৩০৯

১ কবির ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের কন্যা শ্রীমতী শান্তা। গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।
প্র. অর্থাৎ সাময়িক পত্রে প্রচার।

এপ্রিলের ফুল

বসন্তের ফুল তোরই
স্থধাস্পর্শে লেপা
আমারে করিল আজি
এপ্রিলের ক্ষেপা।
পাকা চুল কেঁচে গেল,
বুদ্ধি গেল ফেঁসে—
যে দেখে আমার দশা
সেই যায় হেসে।
বিনা বাক্যে ঘটাইলি
এমন প্রমাদ,
তারি সঙ্গে আছে আরো
বচনের ফাঁদ।
আমি যে মেনেছি হার
নিজেরেই ছলি,
অবোধ সেজেছি কেন
কারণটা বলি।

এপ্রিলের ফুল

বিপাকের সেতু একা
নহে তরিবার—
পাশে এসে ধরো হাত,
জোড়ে হব পার।

[১৩২০ ? চৈত্র]

শ্রীমতী নলিনী দেবীর প্রেরিত স-পুষ্প কৌতুককবিতার উত্তরে।

সুসীম চা-চক্র

হায় হায় হায়
দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চল
চল চল হে!
টগবগ উচ্ছল
কাথলিতলজল
কলকল হে!

এল চীনগগন হতে
পূর্বপবনস্রোতে
শ্যামল রসধরপুঞ্জ।
শ্রাবণবাসরে
রস ঝরঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ
দলবল হে!

সুসীম চা-চক্র

এস পুঁথিপরিচারক
তদ্ধিতকারক
তারক তুমি কাণ্ডারী
এস গণিতধুরন্ধর
কাব্যপুরন্দর
ভূবিবরণভাণ্ডারী !
এস বিশ্বভারনত
শুষ্ক রুটিনপথ-
মরুপরিচারণক্লান্ত !
এস হিসাবপত্তর-ত্রস্ত
তহবিল'-মিল'-ভুল'-গ্রস্ত
লোচনপ্রান্ত-
ছলছল হে !

এস গীতিবীথিচর
তম্বুরকরধর
তানতালতলমগ্ন
এস চিত্রী চটপট
ফেলি তুলিকপট
রেখাবর্ণবিলগ্ন !

এস কন্‌স্‌টিট্যুশন-
নিয়মবিভূষণ
তর্কে অপরিশ্রান্ত।
এস কমিটিপলাতক
বিধানঘাতক
এস দিগ্‌ভ্রান্ত
টলমল হে!

[শান্তিনিকেতন
শ্রাবণ ১৩৩১]

শান্তিনিকেতনে চা-চক্র প্রবর্তন উপলক্ষে রচিত। স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ-সহ পাঠযোগ্য তথা গেয়।

চাতক

কী রসসুধা-বরষাদানে মাতিল সুধাকর
তিব্বতীয় শাস্ত্রগিরিশিরে !
তিয়াষিদল সহসা এত সাহসে করি ভর
কী আশা নিয়ে বিধুরে আজি ঘিরে !
পাণিনিরসপানের বেলা দিয়েছে এরা ফাঁকি,
অমরকোষ-ভ্রমর এরা নহে ।
নহে তো কেহ সারস্বতরস-সারস পাখি,
গৌড়পাদ-পাদপে নাহি রহে ।
অনুস্বরে ধনুঃশর-টঙ্কারের সাড়া
শঙ্কা করি দূরে দূরেই ফেরে ।
শঙ্কর-আতঙ্কে এরা পালায় বাসা-ছাড়া,
পালি ভাষায় শাসায় ভীরুদেরে ।
চা-রসঘন-শ্রাবণধারা-প্লাবন-লোভাতুর
কলাসদনে চাতক ছিল এরা,
সহসা আজি কৌমুদীতে পেয়েছে এ কী সুর—
চকোরবেশে বিধুরে কেন ঘেরা ॥

[চৈত্র ১৩৩১]

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন-চা-চক্রে আহূত অতিথিগণের উদ্দেশে ।

নিমন্ত্রণ

প্রজাপতি যাঁদের সাথে পাতিয়ে আছেন সখ্য
আর যাঁরা সব প্রজাপতির ভবিষ্যতের লক্ষ্য
উদর-সেবার উদার ক্ষেত্রে মিলুন উভয়পক্ষ,
রসনাতে রসিয়ে উঠুক নানা রসের ভক্ষ্য।
সত্যযুগে দেবদেবীদের ডেকেছিলেন দক্ষ,
অনাহূত পড়ল এসে মেলাই যক্ষ রক্ষ।
আমরা সে ভুল করব না তো, মোদের অন্নকক্ষ
দুই পক্ষেই অপক্ষপাত দেবে ক্ষুধার মোক্ষ।
আজও যাঁরা বাঁধন-ছাড়া ফুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
বিদায়-কালে দেব তাঁদের আশিস লক্ষ লক্ষ—
'তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে জুটুন কারাধ্যক্ষ'।

এর পরে আর মিল মেলে না—য র ল ব হ ক্ষ

প্র. অগ্রহায়ণ ১৩৪০

প্র. বাঁশরী নাটকের অঙ্গীভূত রূপে সাময়িক পত্রে প্রচার।

নাতবউ

অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত

সুপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।

লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত,

মত্ত মধুপ মিষ্টরসের গন্ধে সে।

দাদামশায়ের মন ভুলাইল নাতিত্বে

প্রবাসবাসের অবকাশ ভরি আতিথ্যে,

সে কথাটি কবি গাঁথি রাখে এই ছন্দে সে॥

সযতনে যবে সূর্যমুখীর অর্ঘ্যটি

আনে নিশান্তে, সেও নিতান্ত মন্দ না।

এও ভালো যবে ঘরের কোণের স্বর্গটি

মুখরিত করি তানে মানে করে বন্দনা।

তবু আরো বেশি ভালো বলি শুভাদৃষ্টকে

থালাখানি যবে ভরি স্বরচিত পিষ্টকে

মোদকলোভিত মুগ্ধ নয়ন নন্দে সে॥

প্রভাতবেলায় নিরালা নীরব অঙ্গনে

দেখেছি তাহারে ছায়া-আলোকের সম্পাতে।

দেখেছি মালাটি গাঁথিছে চামেলি-রঙ্গনে,

সাজি সাজাইছে গোলাপে জবায় চম্পাতে।

আরো সে করুণ তরুণ তনুর সংগীতে
দেখেছি তাহারে পরিবেশনের ভঙ্গিতে,
স্মিতমুখী মোর লুচি ও লোভের দ্বন্দ্বে সে ॥

বলো কোন্ ছবি রাখিব স্মরণে অঙ্কিত—
মালতীজড়িত বঙ্কিম বেণীভঙ্গিমা ?
দ্রুত অঙ্গুলে সুরশৃঙ্গার ঝংকৃত ?
শুভ্র শাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিমা ?
পরিহাসে মোর মৃদু হাসি তার লজ্জিত ?
অথবা ডালিটি দাড়িমে আঙুরে সজ্জিত ?
কিম্বা থালিটি থরে থরে ভরা সন্দেশে ?।

দার্জিলিং
বিজয়া দ্বাদশী ১৩৩৮

মিষ্টান্বিতা

যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে হাঁড়ির মধ্যে
শুধুই কেবল ছিল কি তায় শিষ্টতা।
যত্ন করে নিলেম তুলে গাড়ির মধ্যে,
দূরের থেকেই বুঝেছি তার মিষ্টতা।
সে মিষ্টতা নয় তো কেবল চিনির সৃষ্টি,
রহস্য তার প্রকাশ পায় যে অন্তরে।
তাহার সঙ্গে অদৃশ্য কার মধুর দৃষ্টি
মিশিয়ে গেছে অশ্রুত কোন্ মন্তরে।
বাকি কিছুই রইল না তার ভোজন-অন্তে,
বহুত তবু রইল বাকি মনটাতে—
এমনি করেই দেব্‌তা পাঠান ভাগ্যবন্তে
অসীম প্রসাদ সসীম ঘরের কোণটাতে।
সে বর তাঁহার বহন করল যাদের হস্ত
হঠাৎ তাদের দর্শন পাই সুক্ষণেই—
রঙিন করে তারা প্রাণের উদয় অস্ত,
দুঃখ যদি দেয় তবুও দুঃখ নেই॥

হেন গুমর নেইকো আমার, স্তুতির বাক্যে
ভোলাব মন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়।
জানি নে তো কোন্ খেয়ালের ক্রূর কটাক্ষে
কখন্ বজ্র হানতে পার অত্যাশায়।
দ্বিতীয়বার মিষ্ট হাতের মিষ্ট অন্নে
ভাগ্য আমার হয় যদি হোক বঞ্চিত,
নিরতিশয় করব না শোক তাহার জন্যে
ধ্যানের মধ্যে রইল যে ধন সঞ্চিত।
আজ বাদে কাল আদর যত্ন নাহয় কমল,
গাছ মরে যায় থাকে তাহার টবটা তো।
জোয়ারবেলায় কানায় কানায় যে জল জমল
ভাঁটার বেলায় শুকোয় না তার সবটা তো।
অনেক হারাই, তবু যা পাই জীবনযাত্রা
তাই নিয়ে তো পেরোয় হাজার বিস্মৃতি।
রইল আশা, থাকবে ভরা খুশির মাত্রা
যখন হবে চরম শ্বাসের নিঃস্থিতি॥

বলবে তুমি, 'বালাই! কেন বকচ মিথ্যে,
প্রাণ গেলেও যত্নে রবে অকুণ্ঠা।'
বুঝি সেটা, সংশয় মোর নেইকো চিত্তে,
মিথ্যে খোঁটায় খোঁচাই তবু আগুনটা।

মিষ্টান্বিতা

অকল্যাণের কথা কিছু লিখন্সু অত্র,
বানিয়ে-লেখা ওটা মিথ্যে দুষ্টুমি।
তদুত্তরে তুমিও যখন লিখবে পত্র
বানিয়ে তখন কোরো মিথ্যে রুষ্টুমি॥

১ জুন ১৯৩৫
[১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২]

রেলেটিভিটি

তুলনায় সমালোচনাতে

জিভে আর দাঁতে

লেগে গেল বিচারের দ্বন্দ্ব,

কে ভালো কে মন্দ।

বিচারক বলে হেসে,

দাঁতজোড়া কী সর্বনেশে

যবে হয় দেঁতো।

কিন্তু সে সুধাময় লোকবিশেষে তো

হাসিরশ্মিতে,

যাহারে আদরে ডাকি 'অয়ি সুস্মিতে'

পাণিনির শুদ্ধ নিয়মে॥

জিহ্বায় রস খুব জমে,

অথচ তাহার সংস্রবে

দেহখানা যবে

আগাগোড়া উঠে জ্বলি

রস নয়, বিষ তারে বলি॥

স্বভাবে কঠিন কেহ, মেজাজে নরম—

বাহিরে শীতল কেহ, ভিতরে গরম

রেলেটিভিটি

প্রকাশ্যে এক রূপ যার

ঘোমটায় আর।

তুলনায় দাঁত আর জিভ

সবই রেলেটিভ।

হয়তো দেখিবে, সংসারে

দাঁতালো যা মিঠে লাগে তারে,

আর যেটা ললিত রসালো

লাগে নাকো ভালো।

সৃষ্টিতে পাগলামি এই—

একান্ত কিছু হেথা নেই॥

ভালো বা খারাপ লাগা

পদে পদে উলোটা-পালোটা—

কভু সাদা কালো হয়,

কখনো বা সাদাই কালোটা,

মন দিয়ে ভাবো যদ্যপি

জানিবে এ খাঁটি ফিলজফি॥

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৮
[১৪ পৌষ ১৩৪৫]
সকাল

নামকরণ

দেয়ালের ঘেরে যারা
গৃহকে করেছে কারা,
ঘর হতে আঙিনা বিদেশ,
গুরু-ভজা বাঁধা বুলি
যাদের পরায় ঠুলি,
মেনে চলে ব্যর্থ নিদেশ,
যাহা-কিছু আজগুবি
বিশ্বাস করে খুবই,
সত্য যাদের কাছে হেঁয়ালি,
সামান্য ছুতোনাতা
সকলই পাথরে গাঁথা,
তাহাদেরই বলা চলে দেয়ালি

আলো যার মিট্‌মিটে,
স্বভাবটা খিট্‌খিটে,
বড়োকে করিতে চায় ছোটো,
সব ছবি ভুষো মেজে
কালো ক'রে নিজেকে যে
মনে করে ওস্তাদ পোটো,

নামকরণ

বিধাতার অভিশাপে
ঘুরে মরে ঝোপে-ঝাপে,
স্বভাবটা যার বদখেয়ালি,
খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে মিছে,
সব-তাতে দাঁত খিঁচে,
তারে নাম দিব খ্যাঁক্‌শেয়ালি ॥

দিন-খাটুনির শেষে
বৈকালে ঘরে এসে
আরাম-কেদারা যদি মেলে—
গল্পটি মনগড়া,
কিছু বা কবিতা পড়া,
সময়টা যায় হেসে খেলে—
দিয়ে জুঁই বেল জবা
সাজানো সুহৃদ-সভা,
আলাপ-প্রলাপ চলে দেদারই—
ঠিক সুরে তার বাঁধা,
মুলতানে তান সাধা,
নাম দিতে পারি তবে কেদারি ॥

শান্তিনিকেতন
৭ মার্চ ১৯৩৯
[২৩ ফাল্গুন ১৩৪৫]

নারীর কর্তব্য

পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে,
মনু-পরাশরদের সাধ্য নাই টানে তারে পিছে।
বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ ;
খাওয়া-ছোঁওয়া সব-তাতে তর্ক করে, বাধে গোলযোগ

মেয়েরা বাঁচাবে দেশ, দেশ যবে ছুটে যায় আগে।
হাই তুলে দুর্গা ব'লে যেন তারা শেষ-রাতে জাগে ;
খিড়কির ডোবাটাতে সোজা
ব'হে যেন নিয়ে আসে যত এঁটো বাসনের বোঝা ;
মাজা-ঘষা শেষ ক'রে আঙিনায় ছোটে—
ধড়্‌ফড়ে জ্যান্ত মাছ কোটে
দুই হাতে ল্যাজামুড়ো জাপটিয়ে ধ'রে
সুনিপুণ কবজির জোরে,
ছাই পেতে বঁটির উপরে চেপে ব'সে,
কোমরে আঁচল বেঁধে ক'ষে।
কুটিকুটি বানায় ইঁচোড় ;
চাকা চাকা করে থোড়,
আঙুলে জড়ায় তার সুতো ;
মোচাগুলো ঘস্ ঘস্ কেটে চলে দ্রুত ;

চালতারে
বিশ্লেষণ করে খরধারে।
বেগুন পটোল আলু খণ্ড খণ্ড হয় সে অগুন্তি।
তার পরে হাতা বেড়ি খুন্তি ;
তিন-চার দফা রান্না সে
নানা ফরমাশে—
আপিসের, ইস্কুলের, পেট-রোগা রুগির কোনোটা,
সিদ্ধ চাল, সরু চাল, ঢেঁকিছাঁটা, কোনোটা বা মোটা।
যবে পাবে ছুটি
বেলা হবে আড়াইটা। বিড়ালকে দিয়ে কাঁটাকুটি
পান-দোক্তা মুখে পুরে দিতে যাবে ঘুম ;
ছেলেটা চেঁচায় যদি পিঠে কিল দেবে ধুমাধুম,
বলবে 'বজ্জাত ভারি'।
তার পরে রাত্রে হবে রুটি আর বাসি তরকারি॥

জনার্দন ঠাকুরের
পানাপুকুরের
পাড়ের কাছটা ঢাকা কলমির শাকে।
গা ধুয়ে তাহারই এক ফাঁকে,
ঘড়া কাঁখে, গায়েতে জড়ায়ে ভিজে শাড়ি
ঘন ঘন হাত নাড়ি

খস্‌খস্‌-শব্দ-করা পাতায় বিছানো বাঁশবনে
রাম নাম জপি মনে মনে
ঘরে ফিরে যায় দ্রুতপায়ে
গোধূলির ছম্‌ছমে্‌ অন্ধকার-ছায়ে।
সন্ধেবেলা বিধবা ননদি বসে ছাতে,
জপমালা ঘোরে হাতে।
বউ তার চুলের জটায়
চিরুনি-আঁচড় দিয়ে কানে কানে কলঙ্ক রটায়
পাড়াপ্রতিবেশিনীর— কোনো সূত্রে শুনতে সে পেয়ে
হন্তদন্ত আসে ধেয়ে
ও-পাড়ার বোসগিন্নি ; চোখা চোখা বচন বানায়ে
স্বামীপুত্র-খাদনের আশা তারে যায় সে জানায়ে॥

কাপড়ে-জড়ানো পুঁথি কাঁখে
তিলক কাটিয়া নাকে
উপস্থিত আচার্যি-মশায়—
গিন্নির মধ্যমপুত্র শনির দশায়,
আটক পড়েছে তার বিয়ে ;
তাহারই ব্যবস্থা নিয়ে
স্বস্ত্যয়নের ফর্দ মস্ত,
কর্তারে লুকিয়ে তারই খরচের হল বন্দোবস্ত॥

এমনি কাটিয়ে যায় সনাতনী দিনগুলি যত
চাটুজ্জেমশা'র অনুমত—
কলহে ও নামজপে, ভবিষ্যৎ জামাতার খোঁজে,
নেশাখোর ব্রাহ্মণের ভোজে ॥

মেয়েরাও বই যদি নিতান্তই পড়ে
মন যেন একটু না নড়ে।
নূতন বই কি চাই। নূতন পঞ্জিকাখানা কিনে
মাথায় ঠেকায়ে তারে প্রণাম করুক শুভদিনে।
আর আছে পাঁচালির ছড়া,
বুদ্ধিতে জড়াবে জোরে ন্যাশন্যাল কাল্‌চারের দড়া।
দুর্গতি দিয়েছে দেখা; বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ,
বি-এ এম-এ পাস ক'রে ছড়াইছে বীজ
যুক্তি-মানা ঘোর ম্লেচ্ছতার।
ধর্মকর্ম হল ছারখার।
শীতলামায়ীরে করে হেলা;
বসন্তের টিকা নেয়; 'গ্রহণের বেলা
গঙ্গাস্নানে পাপ নাশে'
শুনিয়া মূর্খের মতো হাসে ॥

তবু আজও রক্ষা আছে, পবিত্র এ দেশে
অসংখ্য জন্মেছে মেয়ে পুরুষের বেশে।

মন্দির রাঙায় তারা জীবরক্তপাতে,
সে রক্তের ফোঁটা দেয় সন্তানের মাথে।
কিন্তু, যবে ছাড়ে নাড়ী
ভিড় ক'রে আসে দ্বারে ডাক্তারের গাড়ি।
অঞ্জলি ভরিয়া পূজা নেন সরস্বতী,
পরীক্ষা দেবার বেলা নোটবুক ছাড়া নেই গতি।
পুরুষের বিদ্যে নিয়ে কলেজে চলেছে যত নারী
এই ফল তারই।
মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে পুরুষ যখন ঠাণ্ডা হবে,
দেশখানা রক্ষা পাবে তবে॥

বুঝি নে একটা কথা, ভয়ের তাড়ায়
দিন দেখে তবে যেথা ঘরের বাহিরে পা বাড়ায়
সেই দেশে দেবতার কুপ্রথা অদ্ভুত,
সবচেয়ে অনাচারী সেথা যমদূত।
ভালো লগ্নে বাধা নেই, পাড়ায় পাড়ায় দেয় ডঙ্কা।
সব দেশ হতে সেথা বেড়ে চলে মরণের সংখ্যা॥

বেস্পতিবারের বারবেলা
এ কাব্য হয়েছে লেখা, সামলাতে পারব কি ঠেলা॥

[মংপু
বিজয়া দশমী। ৫ কার্তিক ১৩৪৬]

লিখি কিছু সাধ্য কী

লিখি কিছু সাধ্য কী !
যে দশা এ অভাগার লিখিতে সে বাধ্য কি ?
মশা-বুড়ি মরেছিল চাপড়ের যুদ্ধে সে—
পরলোকগত তার আত্মার উদ্দেশে
আমারি লেখার ঘরে আজি তার শ্রাদ্ধ কি !
যেখানে যে-কেহ ছিল আত্মীয় পরিজন
অভিজাতবংশীয় কেহ, কেহ হরিজন—
আমারই চরণজাত তাহাদের খাদ্য কি !
বাঁশি নেই, কাঁসি নেই, নাহি দেয় হাঁক সে,
পিঠেতে কাঁপাতে থাকে এক-জোড়া পাখ সে—
দেখিতে যেমনি হোক তুচ্ছ সে বাদ্য কি !
আশ্রয় নিতে চাই মেলে যদি shelter,
এক ফোঁটা বাকি নেই নেবুঘাস-তেলটার—
মশারি দিনের বেলা কভু আচ্ছাদ্য কি ?
গাল তারে মিছে দিই অতি অশ্রাব্য,
হাতে পিঠ চাপড়াব সেটা যে অভাব্য—

এ কাজে লাগাব শেষে চটি-জোড়া পাদ্য কি ?
পুজোর বাজারে আজি যদি লেখা না জোটাই,
দুটো লাইনের মতো কলমটা না ছোটাই—
সম্পাদকের সাথে রবে সৌহার্দ্য কি ?

[মংপু
আশ্বিন/কার্তিক ১৩৪৬]

মাছিতত্ত্ব

মাছিবংশেতে এল অদ্ভুত জ্ঞানী সে,
আজন্ম ধ্যানী সে।
সাধনের মন্ত্র তাহার
ভন্‌ভন্‌-ভন্‌ভন্‌কার।
সংসারে দুই পাখা নিয়ে দুই পক্ষ—
দক্ষিণ-বাম আর ভক্ষ্য-অভক্ষ্য—
কাঁপাতে কাঁপাতে পাখা সূক্ষ্ম অদৃশ্য
দ্বৈতবিহীন হয় বিশ্ব।
সুগন্ধ পচা-গন্ধের
ভালো মন্দের
ঘুচে যায় ভেদবোধ-বন্ধন ;
এক হয় পঙ্ক ও চন্দন।
অঘোরপন্থ সে যে শবাসন-সাধনায়
ইঁদুর কুকুর হোক কিছুতেই বাধা নাই—
বসে রয় স্তব্ধ,
মৌনী সে একমনা নাহি করে শব্দ।
ইড়া পিঙ্গলা বেয়ে অদৃশ্য দীপ্তি
ব্রহ্মরন্ধ্রে বহে তৃপ্তি।
লোপ পেয়ে যায় তার আছিত্ব,
ভুলে যায় মাছিত্ব ॥

মন তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ ;
মানুষের বক্ষ বা পৃষ্ঠ
কিংবা তাহার নাসিকান্ত
তাই নিয়ে গবেষণা চলে অক্লান্ত—
বার বার তাড়া খায়, গাল খায়, তবুও
হার না মানিতে চায় কভু ও।
পৃথক করে না কভু ইষ্ট অনিষ্ট,
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ;
সমবুদ্ধিতে দেখে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট।
সংকোচহীন তার বিজ্ঞানী ধাত ;
পক্ষে বহন করে অপক্ষপাত।
এদের ভাষায় নেই 'ছি ছি',
শৌখিন রুচি নিয়ে খুঁতখুঁত নেই মিছিমিছি

অকারণ সন্ধানে মন তার গিয়াছে ;
কেবলই ঘুরিয়া দেখে কোথায় যে কী আছে।
বিশ্রামী বলদের পিঠে করে মনোযোগ
রসের রহস্যের যদি পায় কোনো যোগ,
ল্যাজের ঝাপট লাগে পলকেই পলকেই,
বাধাহীন সাধনার ফল পায় বলো কে-ই

মাছিতত্ত্ব

চারি দিকে মানবের বিষম অহংকার,
তারই মাঝে থেকে মনে লেশ নেই শঙ্কার।
আকাশবিহারী তার গতিনৈপুণ্যেই
সকল চপেটাঘাত উড়ে যায় শূন্যেই।
এই তার বিজ্ঞানী কৌশল,
স্পর্শ করে না তারে শত্রুর মৌশল।
মানুষের মারণের লক্ষ্য
ক্ষিপ্র এড়ায়ে যায় নির্ভয়পক্ষ।
নাই লাজ, নাই ঘৃণা, নাই ভয়—
কর্দমে নর্দমা-বিহারীর জয়।
ভন্‌-ভন্‌-ভন্‌কার
আকাশেতে ওঠে তার ধ্বনি জয়ডঙ্কার॥

মানবশিশুরে বলি, দেখো দৃষ্টান্ত—
বার বার তাড়া খেয়ো, নাহি হোয়ো ক্ষান্ত।
অদৃষ্ট মার দেয় অলক্ষ্যে পশ্চাৎ
কখন্‌ অকস্মাৎ—
তবু মনে রেখো নির্বন্ধ,
সুযোগের পেলে নামগন্ধ
চ'ড়ে বোসো অপরের নিরুপায় পৃষ্ঠ,
কোরো তারে বিষম অতিষ্ঠ।

সার্থক হতে চাও জীবনে,
কী শহরে, কী বনে,
পাঠ লহো প্রয়োজনসিদ্ধের
বিরক্ত করবার অদম্য বিত্তের—
নিত্য কানের কাছে ভন্‌ভন্‌ ভন্‌ভন্‌
লুব্ধের অপ্রতিহত অবলম্বন ॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০
[৯ ফাল্গুন ১৩৪৬]

মশকমঙ্গলগীতিকা

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা

জানিতাম দীনতার এই শেষ দশা—

আমি স্বপ্নে দেখিলাম হয়ে গেছি মশা।

কী হল যে দশা—

মধ্যরাত্রে স্বপ্নে আমি হয়ে গেছি মশা।

দীন হতে দীন আমি, ক্ষীণ হতে ক্ষীণ—

একমাত্র নামজপ করেছি ভরসা।

হিংস্রনীতি নাহি আর,

অতিশান্ত নির্বিকার

ভক্তের নাসাগ্র-'পরে স্তব্ধ হয়ে বসা—

কী হল যে দশা!

মধুর মাশবী বেণু নীরব সহসা।

পাখা করি নাড়াচাড়া,

ভোঁ ভোঁ শব্দে নাই সাড়া—

শুধু 'রাম রাম' ধ্বনি ডানা হতে খসা,

হেন হীন দশা!

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা

৩০ অক্টোবর ১৯৪০

[১৩ কার্তিক ১৩৪৭]

ধ্যানভঙ্গ

পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ,
ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ।
ভিজিটর্‌কে এগিয়ে আনে; অটোগ্রাফের বহি
দশ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি।
আনে ফটোগ্রাফের দাবি, রেজেস্টারি চিঠি,
বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি।
পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটর-চাকা,
এমন দৌড় মারেন তখন মিথ্যে তাঁরে ডাকা।
ভাঙা ধ্যানের টুকরো যত খাতায় থাকে পড়ি;
অসমাপ্ত চিন্তাগুলোর শূন্যে ছড়াছড়ি॥

সত্যযুগে ইন্দ্রদেবের ছিল রসজ্ঞান,
মস্ত মস্ত ঋষিমুনির ভেঙে দিতেন ধ্যান—
ভাঙন কিন্তু আর্টিস্‌টিক; কবিজনের চক্ষে
লাগত ভালো, শোভন হত দেব্‌তাদিগের পক্ষে।
তপস্যাটার ফলের চেয়ে অধিক হত মিঠা
নিষ্ফলতার রসমগ্ন অমোঘ পদ্ধতিটা।
ইন্দ্রদেবের অধুনাতন মেজাজ কেন কড়া—
তখন ছিল ফুলের বাঁধন, এখন দড়িদড়া॥

ধ্যানভঙ্গ

ধাক্কা মারেন সেক্রেটারি, নয় মেনকা-রম্ভা—
রিয়লিস্‌টিক আধুনিকের এইমতোই ধরম বা।
ধ্যান খোয়াতে রাজি আছি দেব্‌তা যদি চান তা—
সুধাকান্ত না পাঠিয়ে পাঠান সুধাকান্তা।
কিন্তু, জানি, ঘটবে না তা, আছেন অনিল চন্দ—
ইন্দ্রদেবের বাঁকা মেজাজ, আমার ভাগ্য মন্দ।
সইতে হবে স্থূলহস্ত-অবলেপের দুঃখ,
কলিযুগের চাল-চলনটা একটুও নয় সূক্ষ্ম॥

[১৫ পৌষ ১৩৪৫]

মধুসন্ধায়ী

পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মৌচাকে
একটুকু মধু বাকি থাকে,
যদি তা পাঠাতে পার ডাকে,
বিলাতি সুগার হতে পাব নিস্তার,
প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার।
মধুর অভাব যবে অন্তরে বাজে
'গুড়ং দদ্যাৎ' বাণী বলে কবি-রাজে।
দায়ে প'ড়ে তাই
লুচি-পাঁউরুটিগুলো গুড় দিয়ে খাই;
বিমর্ষমুখে বলি 'গুড়ং দদ্যাৎ',
সে যেন গদ্যের দেশে আসি পদ্যাৎ।
খালি বোতলের পানে চেয়ে চেয়ে চিত্ত
নিশ্বাস ফেলে বলে, সকলই অনিত্য।
সম্ভব হয় যদি এ বোতলটারে
পূর্ণতা এনে দিতে পারে
দূর হতে তোমার আতিথ্য।
গৌড়ী গদ্য হতে মধুময় পদ্য
দর্শন দিতে পারে সদ্য॥

১৩ ফাল্গুন ১৩৪৬

২

তল্লাস করেছিনু, হেথাকার বৃক্ষের
চারি দিকে লক্ষণ মধু-দুর্ভিক্ষের।
মৌমাছি বলবান পাহাড়ের ঠাণ্ডার,
সেখানেও সম্প্রতি ক্ষীণ মধুভাণ্ডার—
হেন দুঃসংবাদ পাওয়া গেছে চিঠিতে।
এ বছর বৃথা যাবে মধুলোভ মিটিতে।
তবু কাল মধু-লাগি করেছিনু দরবার,
আজ ভাবি অর্থ কি আছে দাবি করবার।
মৌচাক-রচনায় সুনিপুণ যাহারা
তুমি শুধু ভেদ কর তাহাদের পাহারা।
মৌমাছি কৃপণতা করে যদি গোড়াতেই,
জাস্তি না মেলে তবু খুশি রব থোড়াতেই।
তাও কভু সম্ভব না হয় যদিস্যাৎ
তা হলে তো অবশেষে শুধু গুড় দদ্যাৎ।
অনুরোধ না মিটুক মনে নাহি ক্ষোভ নিয়ো,
দুর্লভ হলে মধু গুড় হয় লোভনীয়।
মধুতে যা ভিটামিন কম বটে গুড়ে তা,
পূরণ করিয়া লব টমেটোয় জুড়ে তা।
এইভাবে করা ভালো সন্তোষ-আশ্রয়—
কোনো অভাবেই কভু তার নাহি নাশ রয়॥

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০
[১৪ ফাল্গুন ১৩৪৬]

৩

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ

শ্যামল আরণ্য মধু বহি এল ডাক-হরকরা—
আজি হতে তিরোহিতা পাণ্ডুবর্ণা বৈলাতী শর্করা
পূর্বাহ্ণে পরাহ্ণে মোর ভোজনের আয়োজন থেকে ;
এ মধু করিব ভোগ রোটিকার স্তরে স্তরে মেখে।
যে দাক্ষিণ্য-উৎস হতে উৎসারিত এই মধুরতা
রসনার রসযোগে অন্তরে পশিবে তার কথা।
ভেবেছিনু, অকৃতার্থ হয় যদি তোমার প্রয়াস
সস্নেহ আঘাত দিবে তোমারে আমার পরিহাস ;
তখন তো জানি নাই, গিরীন্দ্রের বন্য মধুকরী
তোমার সহায় হয়ে অর্ঘ্যপাত্র দিবে তব ভরি।
দেখিনু, বেদের মন্ত্র সফল হয়েছে তব প্রাণে ;
তোমারে বরিল ধরা মধুময় আশীর্বাদ-দানে ॥

৫ মার্চ ১৯৪০
[২১ ফাল্গুন ১৩৪৬]

৪

দূর হতে কয় কবি,
'জয় জয় মাংপবী,
কমলাকানন তব না হউক শূন্য।
গিরিতটে সমতটে
আজি তব যশ রটে,
আশারে ছাড়ায়ে বাড়ে তব দানপুণ্য।
তোমাদের বনময়
অফুরান যেন রয়
মৌচাক-রচনায় চিরনৈপুণ্য।
কবি প্রাতরাশে তার
না করুক মুখভার,
নীরস রুটির গ্রাসে না হোক সে ক্ষুণ্ণ।'
আরবার কয় কবি,
'জয় জয় মাংপবী,
টেবিলে এসেছে নেমে তোমার কারুণ্য।
রুটি বলে জয়-জয়,
লুচিও যে তাই কয়,
মধু যে ঘোষণা করে তোমারই তারুণ্য।'

৭ মার্চ ১৯৪০
[২৩ ফাল্গুন ১৩৪৬]

কালান্তর

তোমার ঘরের সিঁড়ি বেয়ে

যতই আমি নাবছি

আমায় মনে আছে কিনা

ভয়ে ভয়ে ভাবছি।

কথা পাড়তে গিয়ে দেখি,

হাই তুললে ছুটো ;

বললে উস্‌খুস্‌ করে,

"কোথায় গেল নুটো।"

ডেকে তাকে বলে দিলে,

"ড্রাইভারকে বলিস,

আজকে সন্ধ্যা নটার সময়

যাব মেট্রোপলিস।"

কুকুর-ছানার ল্যাজটা ধরে

করলে নাড়াচাড়া ;

বললে আমায়, "ক্ষমা করো,

যাবার আছে তাড়া।"

কালান্তর

তখন পষ্ট বোঝা গেল

নেই মনে আর নেই

আরেকটা দিন এসেছিল

একটা শুভক্ষণেই—

মুখের পানে চাইতে তখন,

চোখে রইত মিষ্টি ;

কুকুর-ছানার ল্যাজের দিকে

পড়ত নাকো দৃষ্টি ।

সেই সেদিনের সহজ রঙটা

কোথায় গেল ভাসি ;

লাগল নতুন দিনের ঠোঁটে

রুজ-মাখানো হাসি ।

বুটসুদ্ধ পা-ডুখানা

তুলে দিলে সোফায় ;

ঘাড় বেঁকিয়ে ঠেসেঠুসে

ঘা লাগালে খোঁপায় ।

আজকে তুমি শুকনো ডাঙায়

হাল-ফ্যাশানের কূলে,

ঘাটে নেমে চমকে উঠি

এই কথাটাই ভুলে ॥

এবার বিদায় নেওয়াই ভালো,
সময় হল যাবার—
ভুলেছ যে ভুলব যখন
আসব ফিরে আবার ॥

শান্তিনিকেতন
১৩ শ্রাবণ ১৩৪৭

তুমি

ওই ছাপাখানাটার ভূত,
আমার ভাগ্যবশে তুমি তারই দূত।
দশটা বাজল তবু আস নাই ;
দেহটা জড়িয়ে আছে আরামের বাসনাই ;
মাঝে থেকে আমি খেটে মরি যে—
পণ্য জুটেছে, খেয়াতরী যে
ঘাটে নাই। কাব্যের দধিটা
বেশ করে জমে গেছে, নদীটা
এইবার পার ক'রে প্রেসে লও,
খাতার পাতায় তারে ঠেসে লও।
কথাটা তো একটুও সোজা নয় ;
স্টেশন-কুলির এ তো বোঝা নয়।
বচনের ভার ঘাড়ে ধরেছি,
চিরদিন তাই নিয়ে মরেছি ;
বয়স হয়েছে আশি, তবুও
সে ভার কি কমবে না কভুও॥

আমার হতেছে মনে বিশ্বাস—
সকালে ভুলালো তব নিশ্বাস

রান্নাঘরের ভাজাভুজিতে,
সেখানে খোরাক ছিলে খুঁজিতে,
উতলা আছিল তব মনটা,
শুনতে পাও নি তাই ঘণ্টা ॥

শুঁটকি মাছের যারা রাঁধুনিক
হয়তো সে দলে তুমি আধুনিক।
তব নাসিকার গুণ কী যে তা,
বাসি দুর্গন্ধের বিজেতা
সেটা প্রোলিটেরিটের লক্ষণ,
বুর্জোয়া-গর্বের মোক্ষণ।
রৌদ্র যেতেছে চড়ে আকাশে,
কাঁচা ঘুম ভেঙে মুখ ফ্যাকাশে।
ঘন ঘন হাই তুলে গা-মোড়া,
ঘস্‌ঘস্‌ চুলকোনো চামোড়া।
আ-কামানো মুখ ভরা খোঁচাতে—
বাসি ধুতি, পিঠ ঢাকা কোঁচাতে।
চোখ দুটো রাঙা যেন টোমাটো,
আলুথালু চুলে নাই পোমাটো।
বাসি মুখে চা খাচ্ছ বাটিতে,
গড়িয়ে পড়ছে ঘাম মাটিতে।

তুমি

কাঁকড়ার চচ্চড়ি রাত্রে,
এঁটো তারই পড়ে আছে পাত্রে।
'সিনেমার তালিকার কাগজে
কে সরালো ছবি' ব'লে রাগো যে॥

যত দেরি হতেছিল ততই যে
এই ছবি মনে এল স্বতই যে।
ভোরে ওঠা ভদ্র সে নীতিটা,
অতিশয় খুঁৎখুঁতে রীতিটা।
সাফ্‌সোফ বুর্জোয়া অঙ্গেই
ধব্‌ধবে চাদরের সঙ্গেই
মিল তার জানি অতিমাত্র—
তুমি তো নও সে সৎ-পাত্র।
আজকাল বিড়ি-টানা শহুরে
যে চাল ধরেছ আর্ট-পন্থুরে,
মাসিকেতে একদিন কে জানে
অধুনাতনের মন-ভেজানে
মানে-হীন কোনো এক কাব্য
নাম করি দিবে অশ্রাব্য॥

শান্তিনিকেতন
৪ অগস্ট ১৯৪০
[১৯ শ্রাবণ ১৩৪৭]

তোমার বাড়ি

ওই দেখা যায় তোমার বাড়ি
চৌদিকে-মালঞ্চ-ঘেরা,
অনেক ফুল তো ফোটে সেথায়,
একটি ফুল সে সবার সেরা।
নানা দেশের নানা পাখি
করে হেথায় ডাকাডাকি,
একটি স্বর যে মর্মে বাজে
যতই গাহুক বিহঙ্গেরা।
যাতায়াতের পথের পাশে
কেহ বা যায় কেহ আসে,
বারেক যেজন বসে সেথায়
তার কভু আর হয় না ফেরা!
কেউ বা এসে চা করে পান,
গ্রামোফোনে কেউ শোনে গান,
অকারণে যারা আসে
ধন্য যে সেই রসিকেরা॥

উদয়ন
১৩।১২।৪০
[২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭]

হ্যারাম

কখনো সাজায় ধূপ

কখনো বা মাল্য,

গ্ল্যাক্সোধারায় মনে

এনে দেয় বাল্য।

সরিষার তেলে দেহ

দেয় ক'ষে মাজিয়া।

নিয়মের ত্রুটি হলে

করে ঘোর কাজিয়া—

কোথা হতে নেমে আসে

বকুনির ঝাঁক তার,

তর্জনী তুলে বলে

'ডেকে দেবো ডাক্তার'।

এইমত বসে আছি

আরামে ও ব্যারামে

যেন বোগ্‌দাদে কোন্‌

নবাবের হ্যারামে॥

১৫।১২।৪০

[২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭]

মিলের কাব্য

নারীকে আর পুরুষকে যেই মিলিয়ে দিলেন বিধি
পদ্য কাব্যে মানবজীবন পেল মিলের নিধি।
কেবল যদি পুরুষ নিয়ে থাকত এ সংসার
গদ্যকাব্যে এই জীবনটা হ'ত একাকার।
প্রোটন এবং ইলেক্‌ট্রনের যুগল মিলনেই
জগৎটা যে পদ্য তাহার প্রমাণ হল সেই।
জলে এবং স্থলে মিলে ছন্দে লাগায় তাল,
আকাশেতে মহাগদ্য বিছান মহাকাল।
কারণ তিনি তপস্বী যে— বিশ্ব তাঁহার জ্ঞানে,
প্রলয় তাঁহার ধ্যানে॥

স্বষ্টিকার্যে আলো এবং আঁধার
অনন্তকাল ধুয়ো ধরায় মিলের ছন্দ বাঁধার।
জাগরণে আছেন তিনি শুদ্ধ জ্যোতির দেশে,
আলো-আঁধার-'পরে তাঁহার স্বপ্ন বেড়ায় ভেসে।
যারে বলি বাস্তব সে ছায়ার লিখন লিখা,
অন্তবিহীন কল্পনাতে মহান মরীচিকা।
দিদিমণি, বাস্তব নও নিশ্চয় তা জেনো।
বিশ্বকবির স্বপ্ন বললে রাগ কোরো না যেন॥

মিলের কাব্য

বাস্তব যে অচল অটল— বিশ্বকাব্যে তাই
তড়িৎকণার নৃত্য আছে, বাস্তব তো নাই।
গোলাপগুলোর পাপড়ি চেয়ে শোভাটাই যে সত্য,
কিন্তু শোভা কী পদার্থ কথায় হয় না কথ্য।
বিশুদ্ধ ইঙ্গিত সে মাত্র, তাহার অধিক কী সে—
কিসের বা ইঙ্গিত সে জিনিস ভেবে কে পায় দিশে।
নিউস্‌পেপার আছে, পাবে প্রমাণযোগ্য বাক্য—
মোকদ্দমার দলিল আছে ঠিক কথাটার সাক্ষ্য।
কাব্য বলে বেঠিক কথা, এক হয়ে যায় আর—
যেমন বেঠিক কথা বলে নিখিলসংসার।
আজকে যাকে বাষ্প দেখি কালকে দেখি তারা—
কেমন ক'রে বস্তু বলি! প্রকাণ্ড ইশারা।
ফোটা ঝরার মধ্যখানে এই জগতের বাণী
কী যে জানায় কালে কালে স্পষ্ট কি তা জানি।
বিশ্ব থেকে ধার নিয়েছি তাই আমরা কবি—
সত্যরূপে ফুটিয়ে তুলি অবাস্তবের ছবি।
ছন্দ ভাষা বাস্তব নয়, মিল যে অবাস্তব—
নাই তাহাতে হাট-বাজারের গন্ধ-কলরব।
হাঁ-য়ে না-য়ে যুগল নৃত্য কবির রঙ্গভূমে।
এতক্ষণ তো জাগায় ছিলুম, এখন চলি ঘুমে॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২০ জানুয়ারি ১৯৪১
[৭ মাঘ ১৩৪৭] প্রাতে

বেঁটেছাতাওয়ালি

ও আমার বেঁটেছাতাওয়ালি,
বৃথাই সময় তুই খোয়ালি।
বাদল থামিল যবে
ভাবিনু সুযোগ হবে,
তখন কেন গো বেলা পোয়ালি!
মেঘ করে গুরুগুরু,
প্রলয় হইবে শুরু—
আকাশ হয়েছে ঘোর ধোঁয়ালি॥

ও আমার বেঁটেছাতাওয়ালি,
তুই আসিলি না ব'লে
দিন বৃথা গেল চলে—
ধরণী চোখের জলে ধোয়ালি।
ও আমার বেঁটেছাতাওয়ালি,
ঝড়ের গাছের প্রায়
দুঃখের ঝাপটায়
মনটা মাটির পানে নোয়ালি॥

বেঁটেছাতাওয়ালি

ও আমার বেঁটেছাতাওয়ালি,
এত ক্ষণে এল রোদ,
আরাম হতেছে বোধ—
আকাশে সোনার কাঠি ছোঁয়ালি॥

২১ এপ্রিল ১৯৪১
[৮ বৈশাখ ১৩৪৮]
'কালবৈশাখী ঝড়ের পর বেলা ৪।২০ মিনিটে
বুড়ির উদ্দেশে'

দিদিমণি

দিদিমণি আঁট করে দিলে মোর দিন,
এক করে দিলে যেন ছিল যেটা তিন।
প্রহরে প্রহরে সব নিয়মেতে বাঁধা,
ডাক্তারি ফাঁদে এই জীবনটা আগাগোড়া ফাঁদা।
সারি সারি ওষুধের শিশি
খাড়া আছে তর্জনী তুলে দিবানিশি।
যদি তারি কোনো ফাঁকে তবু
সুস্থ লোকের চালে চলিতে সাহস করি কভু
চোখে তবে পড়ে সেটা তোমার তখুনি,
স্পর্ধা মানিয়া লয়ে চুপ করে শুনি যে বকুনি।
গ্ল্যাক্সো খাওয়াও তুমি গুনে গুনে চামচেতে মেপে,
বই খুলে বসি যদি দাও সেটা চেপে।
বলো, 'পড়া থাক্-না!'
দিনটাকে ঢেকে রাখে সেবা-গাঁথা ঢাক্‌না॥

স্নানে গেছ, সেই ফাঁকে খাতা
টেনে নিয়ে লিখি এই যা'-তা'।
মিথ্যার রসে মিশে সত্যটা হলে উপাদেয়,
সাহিত্যে সেটা নয় হেয়।

দিদিমণি

গদ্যে যাহারে বলে মিথ্যে
সেটাই যে ছন্দের নৃত্যে
সত্যেরও বেশি পায় দাম—
এ কথাটা লিখে রাখিলাম ॥

[১৯৪০-৪১]

গ্রন্থপরিচয়

১৩৪৫ পৌষে প্রহাসিনী কাব্যের প্রথম প্রচার। ১৩৫২ পৌষের সংস্করণে এক দিকে যেমন 'খাপছাড়া' পর্যায়ের তিনটি কবিতা বাদ দেওয়া হয়• তেমনি সংযোজন-অংশে সংকলন করা হয় চৌদ্দটি নূতন কবিতা। বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডে প্রহাসিনী-সংকলনকালে (১৩৫৪ আশ্বিন), প্রহাসিনীর নূতন সংস্করণেরই অনুসরণ করা হয়, অধিকন্তু সংযোজন-অংশে স্থান পায় আরো সাতটি নূতন কবিতা এবং বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গ-সূত্রে অগ্রথিতপূর্ব আরো দুইটি।

প্রহাসিনীর বর্তমান সংস্করণে এই পর্যায়ের রচনা-সংকলন আরো পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করা হইয়াছে ; ফলে রবীন্দ্র-রচনাবলীর অতিরিক্ত রবীন্দ্রনাথ-রচিত স্মিত কৌতুক-রসের আরো সাতটি কবিতা সংযোজনে ও নূতন গ্রন্থপরিচয়ে সহজেই স্থান লইয়াছে। কবিতাগুলির সন্নিবেশ-ক্রমে একটি সামগ্রিক তালিকা দিলেই ইহা স্পষ্ট হইবে। ইতঃপূর্বে সাময়িক পত্রে প্রচার হইয়া থাকিলে পৃষ্ঠাঙ্কসহ তাহারও বিশদ উল্লেখ থাকিবে।—

১ প্রবেশক : ধূমকেতু মাঝে মাঝে[১]

২ আধুনিকা — প্রবাসী। ১৩৪১ চৈত্র পৃ. ৮৩০

৩ নারীপ্রগতি — বিচিত্রা। ১৩৪১ মাঘ পৃ. ১

৪ রঙ্গ — বঙ্গলক্ষ্মী। ১৩৪২ কার্তিক পৃ. ৪২১

৫ পরিণয়মঙ্গল — বিচিত্রা। ১৩৪২ চৈত্র পৃ. ৫৬৩

• প্রহাসিনীর প্রথম প্রচার-সময়ে বর্তমান তালিকা-ধৃত চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংখ্যার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল এই তিনটি 'খাপছাড়া' কবিতা—

১. পাবনায় বাড়ি হবে। দ্রষ্টব্য প্রচল খাপছাড়া গ্রন্থে : সংযোজন-১

২. বালিশ নেই সে ঘুমোতে যায় }
৩. পাঁচ দিন ভাত নেই } প্রচল চিত্রবিচিত্র গ্রন্থের অঙ্গীভূত

৬	ভাইদ্বিতীয়া	প্রবাসী। ১৩৪৩ পৌষ পৃ. ৩২৯
৭	ভোজনবীর	পরিচয়। ১৩৩৯ বৈশাখ পৃ. ৬৫৭
৮	অপাক-বিপাক	দেশ। ১৩ আশ্বিন ১৩৬৮ পৃ. ৭৮৫
৯	গল্প-ঠিকানি	প্রবাসী। ১৩৪৫ আশ্বিন পৃ. ৭৬৩
১০	অনাদৃতা লেখনী	বিচিত্রা। ১৩৪৪ বৈশাখ পৃ. ৪২১
১১	পলাতকা	বিচিত্রা। ১৩৪১ চৈত্র পৃ. ২৭৯
১২	কাপুরুষ	দেশ। ১৩ মাঘ ১৩৬৮ পৃ. ১১৮০
১৩	গৌড়ী রীতি	পরিচয়। ১৩৩৯ বৈশাখ পৃ. ৬৫৯
১৪	অটোগ্রাফ[১]	
১৫	মাল্যতত্ত্ব[১]	

সংযোজন

১৬	নাসিক হইতে খুড়ার পত্র	ভারতী। ১২৯৩ ভাদ্র-আশ্বিন পৃ. ৩২৬
১৭	পত্র	ভারতী। ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ পৃ. ১৭০
১৮	সালগম-সংবাদ	ভারতী। ১৩০৯ ভাদ্র পৃ. ৪৬৯
১৯	এপ্রিলের ফুল	বঙ্গলক্ষ্মী। ১৩৪৫ চৈত্র পৃ. ২৫৩
২০	সুসীম-চাচক্র	শান্তিনিকেতন। ১৩৩১ শ্রাবণ পৃ. ১২৯
২১	চাতক	বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৩৫০ কার্তিক পৌষ পৃ. ১৩৮
২২	নিমন্ত্রণ	ভারতবর্ষ। ১৩৪০ অগ্রহায়ণ পৃ. ৮২৭
২৩	নাতবউ	বিচিত্রা। ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ পৃ. ৫৬৩
২৪	মিষ্টান্বিতা	পরিচয়। ১৩৪২ শ্রাবণ পৃ. ১০৫
২৫	রেলেটিভিটি	অলকা। ১৩৪৬ ভাদ্র
২৬	নামকরণ	প্রবাসী। ১৩৪৬ পৌষ পৃ. ৩০১
২৭	নারীর কর্তব্য	অলকা। ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ পৃ. ২০৩
২৮	লিখি কিছু সাধ্য কী[১]	

১ সাময়িক পত্রে প্রচারের বিষয় জানা নাই।

২৯ মাছিতত্ত্ব	শনিবারের চিঠি। ১৩৪৬ চৈত্র পৃ. ৭৭১
৩০ মশকমঙ্গলগীতিকা	বঙ্গলক্ষ্মী। ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ
৩১ ধ্যানভঙ্গ	বঙ্গলক্ষ্মী। ১৩৪৬ ভাদ্র পৃ. ৫৪৯
৩২-৩৫ মধুসন্ধায়ী (১-৪)	প্রবাসী। ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ. ৪৭
৩৬ কালান্তর	যুগান্তর। ১৩৪৭ শারদীয় পৃ. ১৮
৩৭ তুমি	নিরুক্ত। ১৩৪৭ আশ্বিন পৃ. ১
৩৮ তোমার বাড়ি	প্রবাসী। ১৩৪৭ ফাল্গুন পৃ. ৬১৪
৩৯ হ্যারাম	প্রবাসী। ১৩৪৭ ফাল্গুন পৃ. ৬১৪
৪০ মিলের কাব্য	কবিতা। ১৩৪৭ চৈত্র পৃ. ১
৪১ বেঁটেছাতাওয়ালি	দেশ। ২৭ বৈশাখ ১৩৪৮ পৃ. ৭৫
৪২ দিদিমণি[১]	

অপিচ গ্রন্থপরিচয়ে[২]

৪৩ রঙ্গ [তুলনীয় ৪]	দেশ। ১১ কার্তিক ১৩৬৮ পৃ. ১০৭৪
৪৪ পত্রদূতী	প্রবাসী। ১৩৪৫ আশ্বিন পৃ. ৭৬২
৪৫ মধুসন্ধায়ী (৫)	পঁচিশে বৈশাখ। ১৩৪৯ (?) পৃ. ২১
৪৬ দিদিমণি [তুলনীয় ৪২]	দেশ। ২০ পৌষ ১৩৪৭ পৃ.
৪৭ পাশের ঘরেতে যবে[১]	
৪৮ সুধাকান্ত[১]	
৪৯ অস্তিত্বের বোঝা	প্রবাসী। ১৩৪৯ চৈত্র পৃ. ৪৮২

৫০ প্রাসঙ্গিক কবিতা : মৎস্যের তৈলেই ইত্যাদি[১]

অতঃপর তালিকা-ধৃত ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী বিভিন্ন কবিতা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সংকলন করা যাইতেছে।—

২ মূল গ্রন্থ ও সংযোজন-ধৃত রচনার সহিত সম্পর্ক-যুক্ত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতা (যেমন সংখ্যা ৪৪, ৪৫, ৪৭ ও ৪৮) এবং বিশিষ্ট পাঠভেদগুলি (যেমন সংখ্যা ৪৩ ও ৪৬) উল্লেখ করা গেল। এ-সকল ক্ষেত্রে সংকলন আংশিক নয়, সামগ্রিক।

২ ও ৩ ॥ ১৩৪১ মাঘের বিচিত্রায় 'নারীপ্রগতি' প্রচারিত হইলে 'অপরাজিতা দেবী' অনুরূপ ছন্দে একটি উত্তর লিখিয়া পাঠান। সেই কবিতা ও তাহার প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'আধুনিকা' একত্র ছাপা হয় ১৩৪১ চৈত্রের প্রবাসী পত্রে, পৃ. ৮২৯-৩৪।

৩ ॥ এই রচনার পূর্বসূত্র ও দীর্ঘতর পূর্বপাঠ আবিষ্কার করা যায় নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রে। দ্রষ্টব্য দেশ পত্রের ১৩৬৮ সনের ২৩ ভাদ্র ও ১৩ আশ্বিন সংখ্যায় 'পত্রাবলী'-ধৃত পত্র ২৪৫ ও ২৬৬। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আলোচ্য কবিতার প্রথম স্তবকের শেষে গ্রন্থে-বর্জিত এই কয়টি ছত্র পাওয়া যায়[৩]—

বোলপুর-পুরী-পথ সেজন্য
চিরদিনতরে হয়েছে ধন্য।
একদা শুনেছি অর্ধ নিশীথে
সুদূর তারার আলোয় মিশিতে
নারীর কণ্ঠ ঝড়ের রাত্রে,
রোমাঞ্চ তারি লেগেছে গাত্রে।
স্বরশররাজি বক্ষে বিঁধায়ে
দস্যুদানবে ফেলেছ কী দায়ে।
চরণের বেগে সেই নারী যে রে
লাজ দিল আজ কল-দানবেরে ॥

উল্লিখিত অংশে যে যে ঘটনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাত হয় পত্রাবলীর এই পত্রে (সংখ্যা ২৬৬ পৃ. ৭৮৬) ও পূর্বোক্ত পত্রে (সংখ্যা ২৪৫ পৃ. ৫০৬) নির্মলকুমারী-লিখিত পাদটীকায়।

৪ ॥ রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে (১৩০১)

---

৩ কবির হাতের লেখায়ই ছবি ছাপা হয় দেশ পত্রে। কিন্তু মনে হয়, অনবধানবশতঃ বিভিন্ন অংশের বিন্যাস যথোচিত হয় নাই। তবে প্রথম স্তবকের পাঠ সন্দেহাতীত।

পূর্বপ্রচলিত যে অপূর্বসুন্দর ছড়াটি একালে বাঙালি শিক্ষিত-সাধারণের গোচরে আনেন, যাহার সূচনাতেই পাই—

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।

এবং যথাক্রমে 'চার ধলো' 'চার রাঙা' 'চার হিম'ও আমাদের অগোচর থাকে না, প্রহাসিনীর বক্ষ্যমাণ ছড়াটি তাহারই সকৌতুক অনুকৃতি সন্দেহ নাই। ইহার উদ্ভবের সূত্র এবং পূর্বপাঠ (আদিপাঠ ?) আমরা পাই নির্মলকুমারী-কর্তৃক প্রচারিত কবির লেখা 'পত্রাবলী'-প্রসঙ্গে (দেশ ১১।৭।৬৮ পৃ. ১০৭৪-৭৫)—

এ তো বড়ো রঙ্গ যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
তিন মিঠে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
বরফি মিঠে জিলেপি মিঠে, মিঠে শোন্‌পাপড়ি-
তাহার অধিক মিঠে কন্যা তোমারি চড় চাপ্‌ড়ি॥

এ তো বড়ো রঙ্গ যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
তিন সাদা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
দই সাদা সন্দেশ সাদা, সাদা মালায় রাবড়ি—
তাহার অধিক সাদা তোমার সিধে ভাষার দাবড়ি॥

এ তো বড়ো রঙ্গ যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
তিন তিতো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
উচ্ছে তিতো পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্তি—
তাহার অধিক তিতো তোমার বিনা ভাষার উক্তি॥

বরানগর
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

নানা রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিতে এই ছড়ার নানা রূপান্তর ঘটে এবং এক সময়ে কৌতুকচ্ছলে এরূপ এক চৌপদী লিখিয়া পাঠান চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে—

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
চার চারু দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
তিন চারু সুকিয়া স্ট্রীটে[৪], হাজরা রোডে[৫], ঢাকায়[৬]—
সবার অধিক চারু বন্দী মৃণাল বাহুর শাখায়॥

৫॥ এ কবিতা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জয়শ্রী দেবী ও শ্রীকুলপ্রসাদ সেনগুপ্তের পরিণয় ('জয়া-মটরু-শুভসম্মিলন') উপলক্ষে রচিত।

৬॥ বরাহনগরের শ্রীমতী পারুল দেবী নাতনি-রূপে কয়েক বার রবীন্দ্রনাথকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠাইয়াছিলেন।[৭] এই কবিতাটি ১৩৪৩ সনের (খৃস্টীয় ১৯৩৬) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় কবির আশীর্বাদ-সহ তাঁহাকে পাঠানো হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৭ তারিখে (১ মাঘ ১৩৪৩) তাঁহাকে পুনশ্চ লেখেন—

বাংলাদেশের সমস্ত দিদি-জাতীয়ার স্তবগানকে তোমার বন্দনা-গানের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছি। এটা তোমার পছন্দ হয় নি। তবু বরানাগরিকাই অগ্রগণ্যা হয়ে রইল, এটা তুমি উপলব্ধি করলে না কেন? দেবীর কোপ দূর হোক, প্রসন্ন হয়ে তিনি বরদান-স্বরূপে বড়ি দান করুন এই আমার প্রার্থনা।

—দেশ। ৯ মাঘ ১৩৪৯ পৃ. ৩৬১

৯॥ রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী রাধারানী দেবীর নিকট হইতে 'অপরাজিতা দেবী'র ১৬ জুন ১৯৩৮ তারিখের ছন্দোবদ্ধ যে দীর্ঘ পত্র পাইয়াছিলেন তাহার শেষাংশে ছিল—

---

৪ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ৫ চারুচন্দ্র দত্ত ৬ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে যাঁহার উল্লেখ তিনি ব্যক্তিবিশেষ বা যে-কোনো ব্যক্তি ইহাই বিতর্কিত বিষয়।

৭ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি (রবীন্দ্রনাথের চিঠি : দেশ। ২৪ পৌষ/২ মাঘ—৯ মাঘ ১৩৪৯) দ্রষ্টব্য।

রবিরাগ জানি, কবি, বাদলেও ফিকা না—
তাই চাই উত্তর (না জানিয়ে ঠিকানা)।

'অপরাজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্বাক্ষরে আলোচ্য কবিতা উহারই জবাবে লিখিয়া 'পত্রদূতী' কবিতাসহ শ্রীমতী রাধারানীর উদ্দেশে পাঠানো হয়। ১৩৪৫ আশ্বিনের প্রবাসী পত্রে এই 'নাৎনির পত্র', 'পত্রদূতী' ও 'গর্-ঠিকানী' যথোচিত ক্রমে পর পর ছাপা হয় (পৃ. ৭৬০-৬২-৬৩)। তন্মধ্যে 'পত্রদূতী' কবিতাটি এ স্থলে সংকলন করা যাইতেছে।—

পত্রদূতী

শ্রীমতী রাধারানী দেবীর প্রতি

গর-ঠিকানিয়া বন্ধু তোমার ছন্দে লিখেছে পত্র,
ছন্দেই তার ইনিয়ে-বিনিয়ে জবাব লিখেছি অত্র।
যন্ত্রের যুগে মেঘদূত তার পদ করিয়াছে নষ্ট,
তাই মাঝে প'ড়ে খামাখা অকাজে তোমারে দিলেম কষ্ট।
আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে মন যেন উড়ো পক্ষী,
বাদ্‌লা হাওয়ায় কোথা উড়ে যায় অজানা কাহারে লক্ষি।
ঠিকানা তাদের রঙিন মেঘেতে লিখে দেয় দূর শূন্য,
খামে-ভরা চিঠি না যদি পাঠাই হয় না তাহারা ক্ষুণ্ণ।
তাহাদের চিঠি আন্‌মনাদের আসে জানালার পার্শ্বে—
যে পড়িতে জানে সেই বোঝে মানে, চিঠিখানি সবাকার সে।
উত্তর তার কখনো কখনো গেয়েছি আমারই ছন্দে,
গুঞ্জন তারই ছড়িয়ে গিয়েছে সিক্ত মাটির গন্ধে।
অচিন মিতার সাথে কারবার সে তো কবিদেরই জন্য,
সে অধরা দেয় সংগীতে ধরা কিন্তু তারা যে অন্য।
জানা অজানার মাঝখানটাতে নাতনি করেছে সন্ধি,
কবির সাধ্য নাই তারে করে পোস্টাপিসের বন্দী।

প্রহাসিনী

মর্ত্যের দেহে মেনে যে নিয়েছে বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে,
তুমি ছাড়া কারে লাগাব তাহার চার পয়সার দৌত্যে ?
জানি এ সুযোগে চাও কিছু কিছু হাল-খবরের অংশ—
হায় রে আয়ুতে খবরের কোঠা প্রায় হয়ে এল ধ্বংস।
সেদিন ছিলাম সাতাশ-আটাশ, আশি আজি সমাসন্ন—
আমার জীবনে এই সংবাদ সবার অগ্রগণ্য ॥

গৌরীপুর ভবন। কালিম্পং
৫ আষাঢ় ১৩৪৫

বহুবিধ সংস্কারে বা পরিবর্তনে এ কবিতা রূপান্তর লাভ করে 'মানসী' কবিতায় (রচনা : কালিম্পং। ২২মে ১৯৪০ বা ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) এবং প্রবাসী পত্রে (শ্রাবণ ১৩৪৭) প্রথম প্রচারের পর সানাই কাব্যে স্থান পায় : আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে ইত্যাদি।

গর্-ঠিকানি কবিতায় দ্বিতীয় স্তবকের শেষ দুই ছত্রের পাঠ প্রথম-প্রকাশিত প্রহাসিনী-সম্মত। প্রবাসীতে ছাপা হয় : তাপের জ্বলন/আনে কি সবারই আলো ?

১০ ॥ এ কবিতায় সূচনার পঞ্চম হইতে অষ্টম অবধি যে কয় ছত্র, কবি স্বতন্ত্র ভাবে তাহা লিখিয়া পাঠান— কবিতা-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু -কর্তৃক (অনুমান হয়) লেখার তাগিদ পাওয়ার ফলে। সে লেখার তারিখ, ১৪ মাঘ ১৩৪৮।[৮] রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত এক 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি'তে (সমকালীন নকলে[৯]) এটুকু যেমন দেখা যায় ইহার পূর্বাপর আর সব ছত্রই পাওয়া যায় পরের ৪ খানি পাতায় তথা পৃষ্ঠায় ; রচনার স্থান-কাল : শান্তিনিকেতন। ১৫ মাঘ ১৩৪৩

১১ ॥ দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতার উদ্দেশে লিখিত। কবিতাটির 'পুনশ্চ' অংশ

---

৮ দ্রষ্টব্য : দেশ-সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮১, 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি' সংখ্যা ১১

৯ সাধারণতঃ রবীন্দ্ররচনায় এবং এরূপ নকলে স্থানকালের ব্যবধান তেমন থাকিত না। নকলের পর অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে নানারূপ পরিবর্তনও করিতেন। এজন্য এগুলির মূল্য অল্প নয় ; এগুলি সর্বৈব রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি না হইলেও, সগোত্র এবং সংশ্লিষ্ট।

'দাদামহাশয়ের চিঠি' নামে ১৯৩৬ নভেম্বরের শ্রীহর্ষ পত্রেও মুদ্রিত।

১৩ ॥ ইহার সংক্ষিপ্ত পূর্বরূপ ১৩৩৬ চৈত্রের বিচিত্রা পত্রে প্রকাশিত—

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই ফুঁকে দেয় তার থ'লে,
লোক তার 'পরে মহা রাগ করে হাতি দেয় নাই বলে।
বহু সাধনায় বিড়াল যে পায় ফুকারে সে "ওহো ওহো",
বলে আঁখি মেজে, "যথেষ্ট এ যে, পরম অনুগ্রহ।"

বিপুল ভোজনে মণের ওজনে ছটাক যদি বা কমে,
সেই ছটাকের চাঁটিতে ঢাকের গালাগালি-বোল জমে।
সমুখে আসিয়া পকেট ঠাসিয়া স্তবের লম্বা দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দারোপণ— ধন্য ধন্য গৌড়।

অবশ্য, ইহার আগেরও একটি রূপ দিলীপকুমার রায়কে লেখা[১০] পত্রের অঙ্গীভূত করিয়া রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সংকলন করা হয় ১৩৩৮ সনের রবীন্দ্রজয়ন্তী-সংখ্যা বাতায়ন হইতে। এ স্থলে তাহাও সংকলনযোগ্য—

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার পরে ভারী রাগ করে হাতি দেয় নাই বলি।
বহু সাধনায় যার কাছে পায় কালো বেড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে নয়নের জলে, 'দাতা বটে ষোলো-আনা!'

[১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩]

১৫ ॥ জগার মালা গাঁথা লইয়া কৌতুকপূর্ণ যে বিতর্ক এ কবিতায় দাদামহাশয় ও নাতনির মধ্যে, প্রায় অর্ধশতাব্দ পূর্বে সে তর্কই উল্টারকম পরিবেশে ও পদ্ধতিতে গদ্যে দেখা দিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের অপর একটি রসরচনায়, 'ভারতী ও বালক'

---

১০ চিঠিতে '৭ নভেম্বর ১৯২৫' তারিখ থাকিলেও বস্তুত: ১৭ নভেম্বর ১৯২৬ হইতে পারে, ত্রয়োবিংশ-খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এরূপ অনুমান করা হয়।

পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল ‘সফলতার দৃষ্টান্ত’ শিরোনামে —এটিও কম কৌতুকাবহ নয়। সে স্থলে জগা মালী নিজে ফুলের তোড়া গাঁথিয়া আনিলেও, যাঁহার জন্য আনা তিনি বলেন—

“আমার মাথা খাইস্‌ জগা, আমার কাছে কিছু গোপন করিস্‌ না, যে এ তোড়া তোকে দিয়াছে তাহার নামটি আমাকে বল্‌!”

মালাকর অনেক ক্ষণ অবাক্‌ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল··· অবশেষে করজোড়ে একান্ত কাতরতা-সহকারে সে উৎকল-উচ্চারণ-মিশ্রিত গ্রাম্য-ভাষায় কহিল— “প্রভো, এ কুসুমগুচ্ছ আমারই স্বহস্তের রচনা।”

—ভারতী ও বালক। আশ্বিন ১২৯৯, পৃ. ৩১২

কিন্তু সে কথা মানিবে কে! আলোচ্য কবিতায় নাতনিও অবশ্যই বিশ্বাস করেন না, জগা মালীর এমন প্রভুপ্রীতি, সুরুচি বা সৌন্দর্যবোধ।

সংযোজন

প্রহাসিনীর বর্তমান সংস্করণের অধিকাংশ ‘সংযোজন’ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত (১৩৫৪ আশ্বিন) ত্রয়োবিংশ-খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলীর অঙ্গীভূত। সংযোজিত অধিকাংশ কবিতা সম্পর্কে নানা তথ্যের সমাহার উহার গ্রন্থপরিচয়ে; তাহার কিয়দংশ মাত্র এ স্থলে সংকলন করা চলিবে। তাহা ছাড়া যেগুলি সম্পূর্ণ নূতন সংযোজন (সংখ্যা ১৮, ১৯, ৩৮, ৩৯, ৪১-৪৩ ও ৪৬-৪৮) সেগুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কোনো কোনো তথ্যের উল্লেখ অপরিহার্য। যথাক্রমে—

১৭ ॥ রবীন্দ্রকথা (১৩৪৮) গ্রন্থে শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন (পৃ. ১৯৭) এ কবিতা কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদ্দেশে লেখা —রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীতে (১৩৭০ আষাঢ়। পৃ. ১৪, পাদটীকা ১) শ্রীপুলিনবিহারী সেন এ কথার উল্লেখ করেন। বর্তমান গ্রন্থে রচনার যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনুমান করেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম-খণ্ড রবীন্দ্রজীবনী (১৩৭৭ বৈশাখ। পৃ. ৩৮৩) গ্রন্থে।

১৮ ॥ ১৩৫৯ শ্রাবণ-আশ্বিনের বিশ্বভারতী পত্রিকায় (পৃ. ৪৩-৪৫) এ

কবিতার সংকলন সময়ে বড়দাদামহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথের যে কবিতার উত্তরে ইহার উদ্ভব সেটি যেমন সর্বাগ্রে বিন্যস্ত হয়, সব শেষে থাকে ইহার প্রত্যুত্তরে পুনশ্চ তিনি যাহা বলেন। অতঃপর বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক জানাইয়া দেন[১১], সত্য-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তা বড়োদাদুর 'নিকট হইতে কবিতায় চিঠি পাইয়া বিপন্ন' হওয়ায় ছোটোদাদু রবীন্দ্রনাথের শরণ লইয়াছিলেন— এ কবিতা তাঁহারই রচনা। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা-পত্রী প্রসঙ্গানুরোধে এ স্থলে সংকলন করা যাইতেছে—

নাতিনীর নিকট হইতে সালগম উপহার পাইয়া দাদামহাশয়ের পত্র

সালগম পাইয়া আমি হর্ষে আটখানা,
গান করিলাম শুরু তোম তানা নানা;
পাইতাম যদি কাছে গাউন-পরা বুড়ি
ওয়াল্‌জ্‌-নাচ নাচিতাম মিলাইয়া জুড়ি।
শান্তা তুমি কান্তা হও যোগ্য রতনের,
তা হলেই খেদ মেটে আমার মনের।
দিলেন মটন-রোস্ট এস্‌-পি-জি বাবাজি[১২],
চারি ধারে সালগম দাঁড়াইল সাজি;
আঁটিনু দু পাটি দাঁত না করি বিলম্ব,
করিনু তাহার পরে কারয আরম্ভ;
সালগমে মটনে দোঁহে সোহাগে গলিয়া
মুহূর্তমাঝারে গেল কোথায় চলিয়া।
কোথায় চলিয়া হায় কোথায় চলিয়া—
পেটের কথা পেটেই থাক্‌, কী হবে বলিয়া।

—দাদামহাশয়

১১ ভারতীর ভাদ্র সংখ্যা হইতে জানা যায় না।

১২ শান্তার পিতা সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়।

১৯ ॥ কবিতা-প্রকাশ-কালে বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানা যায়: প্রায় ২৫ বছর আগে··· দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট বোন··· নলিনী দেবী রহস্যছলে পয়লা এপ্রিলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে একটি কবিতা লিখে পাঠান— খামে ভ'রে কতকগুলি সুগন্ধ ঝুরো ফুল-সহ। নলিনী দেবীর কবিতা ও কবির উত্তর··· উপহার দিচ্ছি।

—বঙ্গলক্ষ্মী। ১৩৪৫ চৈত্র, পৃ. ২৫৩

নলিনী দেবীর মূল-কবিতাটি এ স্থলে সংকলন করা গেল—

পয়লা এপ্রিলে

দাদামহাশয়গণ বড়ো সুচতুর,
কানায় কানায় বুদ্ধি আছে ভরপুর,
চিরদিন এই কথা আসিয়াছি শুনি—
বুঝিয়া লইব আজি কত বড়ো গুণী।
বচনের ফাঁস শুধু বিপাকের হেতু,
তরিতে পারিলে বুঝি দুর্বিপাক-সেতু।

— তত্রৈব

২৪ ॥ শ্রীমতী পারুলদেবীকে পত্রাকারে লিখিত। কবিতার শেষ স্তবক পূর্বে পাঠানো হয় নাই। পরে অর্থাৎ ৫ জুন ১৯৩৫ তারিখে (২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২) তারিখে রবীন্দ্রনাথ এরূপ একটি ভূমিকা ফাঁদিয়া পাঠাইয়া দেন—

আমি আশা করেছিলুম যে, তুমি আমার উপর খুব রাগ করবে, কেননা রাগটা সকল ক্ষেত্রে মন্দ জিনিস নয়— না রাগ করা ঔদাসীন্যের লক্ষণ। তোমাকে রাগাব ব'লেই কবিতাটির শেষ দুটো শ্লোক তোমাকে পাঠাই নি— উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, অতএব এখন পাঠাই। কবিতার প্রথম অংশের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পাঠ কোরো।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা। পৌষ ১৩৪৯

২৬ ॥ এ কবিতার শেষ স্তবকটি ঈষৎ-পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে গল্প-সল্প গ্রন্থে 'চন্দনী' গল্পের পরে সংকলিত। দ্বিতীয় স্তবকের সংকলন ঐ গ্রন্থেই অন্যত্র।

৩১ ॥ এ কবিতা রচনার তারিখ অনুমান করা চলে রবীন্দ্রনাথের ঐ সময়ের একখানি খসড়া-খাতা বা 'ডায়ারি' হইতে। ১৫ পৌষ ১৩৪৫ তারিখে লেখা মাল্যতত্ত্ব কবিতার একরূপ অন্তর্নিবিষ্ট থাকায়, ইহার রচনাও ঐ সময়ে।

এমন-কি, কতকটা বিলম্বিত লয়ের 'মাল্যতত্ত্ব' লেখার কোনো সাময়িক ব্যাঘাত বা বিরতি-জনিত বিরক্তিই এ রচনার উৎস, এমনও মনে করা চলে।

৩২-৩৫ ॥ এ কয়টি কবিতা কবির স্নেহ-পাত্রী মংপু-নিবাসিনী শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর উদ্দেশে লেখা॥ উত্তরকালে তাঁহারই সম্পাদনায় এগুলির পরিশিষ্ট রূপে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি কবিতা 'পঁচিশে বৈশাখ' গ্রন্থে স্থান পায়: এ স্থলে সংকলন করা গেল—

বিবিধজাতীয় মধু গেল যদি পাওয়া,
তবুও রয়েছে কিছু বাকি দাবি-দাওয়া।
এখন স্বয়ং যদি আসিবারে পারো
তা হলে মাধব ঋণ বেড়ে যাবে আরো।
আহারের কালে মধু রহে বটে পাতে—
কিন্তু কোথা, দান করেছিলে যেই হাতে।
ডাক-যোগে সাড়া পাই, থাকো দূর-দেশী—
মোকাবিলা দেখাশোনা দাম ঢের বেশি।
পন্থশিখরের পানে কবি মধুসখা
উড়েছিল মধুগন্ধে— গন্ধ-উপত্যকা
করিবে আশ্রয় আজি স্পষ্টভাষণের
প্রয়োজনে। দুরারোহ তব আসনের

ঠাঁই-বদলের আমি করিতেছি আশা
সংশয় না থাকে কিছু, তাই এই ভাষা।

১১ মার্চ ১৯৪০
[২৭ ফাল্গুন ১৩৪৬]

৩৭ ॥ রবীন্দ্রসদনে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী-সংগ্রহের যে পূর্বতন রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তাহা বহুশঃ ভিন্ন। এ স্থলে সেই পূর্বপাঠের সূচনার ও শেষের কিয়দংশ দেওয়া যাইতেছে।—

বলি শুন, ওগো সুধাকান্ত,
তুমি কি নিরন্তর শ্রান্ত ?···
আটটা বাজল তবু আসো নাই,
জয়ী হল বিরামের বাসনাই।···
মাঝে থেকে আমি খেটে মরি যে—
পণ্য জুটেছে, খেয়াতরী যে
ঘাটে নাই। কাব্যের দধিটা
দিব্যি জমেছে ভাঁড়ে, নদীটা
এইবার পার করে প্রেসে লও।

···

হায় তুমি হলে রিয়ালিস্টিক,
আমি সেই রয়ে গেনু মিস্টিক।
তাই দেখা পাই না তো সকালে,
প্রাচীন কবিরে তুমি ঠকালে।
আমি থাকি পথ চেয়ে হাঁ করে,
তুমি পাশ-বালিশের সাঁকোরে
বাহুপাশে আশ্রয় করিয়া
কাজের বেলাটা যাও তরিয়া।

আটটা নয়টা বাজে দশটা,
মোর প্রাণে কাব্যের রসটা
কেবলই শুকোতে থাকে— রক্ত
হয়ে যায় নিশ্চল শক্ত ॥

২রা শ্রাবণ ১৩৪৭

৩৮ ও ৩৯ ॥ এ দুটি সম্পর্কে বিশেষভাবে এবং এ সময়ের অন্যান্য ছড়া বা কবিতা সম্পর্কে সাধারণভাবে সংকলয়িতা সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর এই কথা-কয়টি স্মরণযোগ্য : 'রবীন্দ্রনাথের রোগ-কক্ষ তাঁর হাল্কাভাব-পুতুলখেলার ঘর। অবসরের বেলা কাটে তাঁর রঙ-বেরঙি ভাবের পুতুল নিয়ে খেলায় ; সে-খেলায় আশি বছরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের আনন্দ তাঁর একার নয়, সে আনন্দ তাঁদের সকলের যাঁরা থাকেন তাঁর আশেপাশে।··· যার যখন ঘটে সুযোগ সে-ই নেয় কুড়িয়ে, রাখে তুলে যত্নে।'[১৩] সংকলিত দুটি কবিতাই যে দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনীর উদ্দেশে, সংকলক তাহা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরা দেবীর তথা নাতনি নন্দিতার বাড়ির নামই 'মালঞ্চ'।

৪০ ॥ ইহার যে পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত তাহা মুখ্যতঃ কবির স্বহস্তে লেখা ; ১৩৪৭ চৈত্রের কবিতা পত্রে নাই এমন দুটি ছত্র তাহাতে পাওয়া যায়। রচনার সমসময়ে যে টাইপ-কপি প্রস্তুত করা হয়, অতিরিক্ত ঐ দুই ছত্র তাহাতেও বর্তমান। কবিতা পত্রের 'কপি'তে "ছাড়" হয় অথবা কবি পরে ঐ দুটি ছত্র যোগ করেন নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও সম্পূর্ণ যে পাঠ বর্তমানে পাওয়া যায়, তাহাই এই গ্রন্থে সংকলিত। রচনার স্থান-কালও সংরক্ষিত কপিঅনুসারে। কবিতা পত্রে এ কবিতার একটি গদ্যভূমিকা ছিল ; তাহা এ স্থলে সংকলন করা গেল।—

মিলের কাব্য

১৯।১।৪১ তারিখের কথা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বসে আছি শয়নকক্ষে

১৩ রবীন্দ্র-দৈনিকী : সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। প্রবাসী, ১৩৩৭ ফাল্গুন, পৃ ৬১৪

কেদারায় হেলান দিয়ে। আমি ঠাট্টা করে বলে থাকি, আমার জীবনের প্রথম পালা কল্যাণ রাগে, তখন সুস্থ শরীরে চলাফেরা চলত, দ্বিতীয় পালা এই কেদারা রাগিণীতে অচল ঠাটে বাঁধা। আকাশ ছিল মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বৃষ্টি হচ্ছে টিপ্ টিপ্ করে। সুধাকান্ত বসে আছে পাশের চৌকিতে। হঠাৎ আমাকে বকুনি পেয়ে বসল। একটা কথা শুরু করলুম অকারণে, বলে গেলুম—

যখন মনে ভাবি কিছু একটা হল, সুখদুঃখের তীব্রতা নিয়ে এমন করে হল যে কোনো কালে তার ক্ষয় হবে ব'লে ধারণাই হয় না, ঠিক সেই মুহূর্তেই মহাকাল পিছনে বসে বসে মুখ ঢেকে তার চিহ্নগুলো মুছতে শুরু করে দিয়েছেন। কিছুকাল পরে দেখি সাদা হয়ে গেছে; মনে যদি বা স্মৃতি থাকে তবু যে অনুভূতি তার সত্যতার প্রমাণ, আজ লেশমাত্র তার বেদনা নাই। তা হলে যেটা হল শেষ পর্যন্ত সেটা কী। সংস্কৃত শ্লোকে প্রশ্ন আছে— রঘুপতির অযোধ্যাপুরী গেল কোথায়! রঘুপতির অযোধ্যা বহু লোকের বহু কালের নানাবিধ সুস্পষ্ট অনুভূতিতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই বিপুল অনুভূতি গেল শূন্য হয়ে। তা হলে যা ছিল সে কী ছিল? মস্ত একটা "না" প্রকাণ্ড একটা "হাঁ"এর আকার ধরেছিল। নাস্তিত্ব সে অস্তিত্বের জাল গেঁথেই চলেছে, আবার সে জাল গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের মধ্যে। এই দুর্বোধ রহস্যকে বাস্তব বলব কেমন করে? এই-যে ইন্দ্রজাল এর মধ্যে দুইয়ের মিল চলেইছে, তাই এ'কে মিত্রাক্ষর কাব্য বলতে হবে— একের উপাদানে সৃষ্টি হয়ই না। সৃষ্টি জোড়-মিলনের কাব্য।

গদ্যের ধারা শেষকালে মুখে মুখে ছড়ার ছন্দে লাইনে লাইনে গাঁঠ বেঁধে চলল। অসুস্থ শরীরে, ও আমার একটা অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ হয়ে উঠেছে। সুধাকান্ত এরই ফলের প্রত্যাশায় বসে থাকেন। আজ বাদল-সন্ধ্যায় হাজ্‌রে দেওয়া তিনি কাজে লাগিয়েছেন তার প্রমাণ দিই।

—কবিতা। ১৩৪৭ চৈত্র, পৃ. ১

৪১ ॥ শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদনে হাতে-লেখা তাৎকালিক (তাৎক্ষণিক বলিলেও হয়তো ভুল হইত না) যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তাহাতে দেশ কাল ও

উপলক্ষ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত; তাহাই গ্রন্থমধ্যে কবিতা-শেষে সংকলিত। দেশ পত্রে বিজ্ঞাপিত রচনাকাল ('১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ মধ্যাহ্ন') ভ্রান্ত মনে না করিলে, প্রাথমিক কোনো খসড়ার দিন-ক্ষণ এমনও হইতে পারে।

৪২ ॥ যে পাঠ 'সংযোজন' অংশে সংকলিত তাহাই আদ্যন্ত রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে পাওয়া যায়। ভিন্ন ছন্দে ঈষৎ ভিন্ন ভাবে রচিত আরেক পাঠের টাইপ-কপি রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত; হয়তো ইহাই পূর্বপাঠ কিন্তু এই অনুমানের নিশ্চিত প্রমাণ দেওয়া যায় না। ঐ পাঠ অতঃপর সংকলন করা গেল।—

[দিদিমণি]

চার দিকে মোর ঠেসে-ঠুসে খাটো করলে দিনকে,
যেন তোমার মুঠোর মধ্যে এক করেছ তিনকে।
থেকে থেকে গ্যাক্‌সো খাওয়াও চামচ দিয়ে মেপে,
একটু নড়াচড়া করলে যাও তখনি ক্ষেপে।
পড়তে গেলে বই চাপা দাও বলো, এখন থাক্‌-না।
প্রহরগুলোর চতুর্দিকে পরিয়ে দিলে ঢাক্‌না।
হাসপাতালের চেহারাতে রচিলে এই নীড়টা,
একেবারে সাফ করেছ যত লোকের ভিড়টা।
ঘড়ি-ধরা নিদ্রা আমার, নিয়ম-ঘেরা জাগা—
একটুকু তার সীমার পারেই আছে তোমার রাগা।
কী কব আর, রবি ঠাকুর ভয়ে তরস্ত—
এত বড়ো মানুষ ছোট্টো হাতের করস্থ।
দুপুর বেলা ঘরে গেছ, সেই ফাঁকে এই খাতা
টেনে নিয়ে লিখে দিলেম তোমার নামে যা-তা।
একটু যদি বাড়িয়ে থাকি সেটা তো সম্ভাব্য—
কথার সীমা রেখে চলা নয় সে কবির কাব্য।

কবির কলম মেতে ওঠে কথার লম্বা চৌড়ায়,
একটু সুযোগ পেলে পরেই চার পা তুলে দৌড়ায়।

—রবীন্দ্র-দৈনিকী : সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। দেশ, ২০ পৌষ ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথের শেষ রোগশয্যা-পার্শ্বে বা সন্নিধানে থাকিয়া যাঁহারা দীর্ঘকাল সযত্নে সাবধানে তাঁহার সেবা করেন, তাঁহাদের অনেকের সম্পর্কই ইঙ্গিত করিয়া অথবা উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন, ছড়া কাটেন (কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক ছড়া বা কবিতা), তাহার সাক্ষ্য আছে 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' কাব্যে ও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়। এই অন্তরঙ্গ সেবকগোষ্ঠীতে কবির স্নেহ-ভাজন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ছিলেন বিশিষ্ট। তিনি স্বভাবতঃ সদালাপী ও রসিক ছিলেন বলিয়াই অনেক সময়ে কবিরও সস্নেহ কৌতুক বা পরিহাসের পাত্র। সংগত কারণেই রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে কাব্যত্রয়ে এগুলির কোনোটি সংকলিত হয় নাই আর স্বয়ং সুধাকান্ত অন্যের সম্পর্কে লেখা বা মুখে-মুখে বলা কবিতা ও ছড়ার সমসাময়িক প্রচারে উদ্যোগী হইলেও,[১৪] নিজেকে সযত্নে আড়ালে রাখেন বলিয়াই মনে হয়। স্নেহের কৌতুকে, সন্দেহ নাই, পার্শ্বচর সুধাকান্ত সম্পর্কেই কবি এরূপ একটি ছড়া কাটেন—

পাশের ঘরেতে ব'সে যবে খাই দই-ভাত,
কান খাড়া করে থাকি যদি কভু দৈবাৎ
কবিমুখ হতে বাণী খ'সে পড়ে আলসে—
তখনি টুকিয়া লই নাই হল ভালো সে।
কাগজে বাহির করি না মরিতে ঝাঁজটা,
এত হুঁশিয়ারি জেনো এডিটরি কাজটা॥

উদয়ন

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ [৩ ফাল্গুন ১৩৪৭]

---

১৪ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে বর্তমান গ্রন্থের 'সংযোজন' ও 'গ্রন্থপরিচয়' -ধৃত এবং পূর্বগামী-তালিকায়-নির্দিষ্ট সংখ্যা ৩৮, ৩৯, ৪১ ও ৪৬

আর, দীর্ঘ কবিতাও লেখেন। যথা[১৫]—

সুধাকান্ত

সুধাকান্ত
বচনের রচনে অক্লান্ত—
মুখে কথা নাহি বাধে,
পশরা ভরিয়া রাখে বহুবিধ কুড়ানো সংবাদে,
প্রত্যহ কণ্ঠের পায় সাড়া
পাড়া হতে পাড়া।
আজি তার আত্মত্যাগ বাক্যত্যাগে হয়েছে কঠোর
রোগীর সেবার কার্যে মোর।
ও পাশের ঘরে
দিন কাটে সঙ্গীহীন নিঃশব্দ প্রহরে।
বাধা দেয় যাদের প্রবেশে
আহা যদি কাছে পেত এই ব'লে মরে যে ক্ষোভে সে।
তবু বিধাতার বর
আছে তার 'পর,
বাক্য রুদ্ধ হয়ে গেলে তবু তার কাছে
অন্য পথ আছে।
অনায়াসে শব্দ আর মিল
কলমের মুখে তার করে কিল্‌বিল্‌।
মোর দিনমান
মুখর খাতায় তার যাহা-তাহা দিতেছে জোগান।

১৫ দ্রষ্টব্য: শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -প্রণীত চতুর্থ-খণ্ড রবীন্দ্রজীবনী (১৩৭১ অগ্রহায়ণ) গ্রন্থে, পৃ. ২৫৮, পাদটীকা ৬

রচে বসি তুচ্ছতার ছবি—
ভয়ে মরি ছাই-চাপা পড়ে বুঝি কবি।
মনে আছে একমাত্র আশা
বুদ্‌বুদের ইতিহাসে সুদীর্ঘ কালের নেই ভাষা।
বাহিরেতে চলিতেছে দেশে দেশে বিরাটের পালা
অকিঞ্চিৎকরের স্তূপ জমাইছে এ আরোগ্যশালা।
লিখিবার কথা কোথা রুদ্ধঘরে দু চক্ষু বুলাই,
কোনোমতে ছড়া কেটে নিজেরে ভুলাই।
ধাক্‌কা তারে দেয় পিছে খ্যাপা ঊনপঞ্চাশ বায়ু,
এ বেলা - ও বেলা তার আয়ু।
এরই মধ্যে কবিবেশে সুধাকান্ত এল—
ইহাকেই বলে না কি 'strange bed-fellow'!

উদয়ন
১২ মার্চ ১৯৪১ বিকাল [২৮ ফাল্গুন ১৩৪৭][১৬]

রবীন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত চিঠিপত্রে কৌতুকপূর্ণ এমন ছড়া বা কবিতাও লেখেন, যাহা প্রসঙ্গবিচ্ছিন্নভাবে লইলে রসাস্বাদন পুরা হয় না। এরূপ দুটি ছড়া বা কবিতা এ স্থলে উদ্ধার করিলেই চলিবে। প্রথমটি

---

১৬ এ কবিতার একটি পূর্বপাঠও (১৮ ছত্র) পাওয়া যায় রবীন্দ্রসদন-দপ্তরে—

আরোগ্যশালার রাজকবি
সুধাকান্ত আঁকে বসি প্রত্যহের তুচ্ছতার ছবি। ইত্যাদি

রচনা : উদয়ন। ২৬ জানুয়ারি ১৯৪১ [১৩ মাঘ ১৩৪৭] প্রান্তে
সম্প্রতি রবীন্দ্রবীক্ষা-১০-এ পাণ্ডুলিপিচিত্র-সহ মুদ্রিত : ৭ পৌষ ১৩৯০।

কালিদাস নাগকে লেখা চিঠিতে এভাবে পাওয়া যায় (এ লেখা রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' পর্বের মধ্যেই পড়ে তাহা না বলিলেও চলে)—

বুয়েনোস আইরিস

[২২ ডিসেম্বর ১৯২৪]

আজ ৭ই পৌষ।··· ২৪ অক্টোবরে "ঝড়" বলে যে কবিতা লিখেছিলুম তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারচি যে, সেই সময়ে হাওয়া বেয়ে একটা নিবিড় ব্যথা আমাকে ঝাপটা দিয়ে গিয়েছিল।··· এবারকার কবিতাগুলো যেন স্বপ্নে লেখা— ভালো কি মন্দ তা বুঝতেই পারিনে— যখন খুসি তখন, যেমন খুসি তেমন করে লিখেই গেছি।··· কিরকম অস্বাস্থ্যের ক্লান্তিতে হিজিবিজি লেখার মেজাজে আজকাল কবিতা লিখি তার একটা ডাকে-মারা-যাওয়া নমুনা তোমাকে নিম্নে লিখে পাঠাই :—

[অস্তিত্বের বোঝা]

অস্তিত্বের বোঝা বহন করা ত নয় সোজা।
পাঠশালে কতকাল পুঁথিদানবের সাথে যোজা[১৭]।
ছেঁড়া ছাতা কক্ষে নিয়ে অহোরাত্র পথে পথে খোঁজা
ডাল-ভাত বধূ-বন্ধু চাকরি-বাকরি জুতো-মোজা।
কোনো মাসে জোটে রুজি কোনো মাসে রুটিশূন্য রোজা।
নানা সুরে হাসি কান্না, বোঝা ও না-বোঝা, ভুল বোঝা।
সভাতলে ছুটোছুটি ঝুটোপুটি রাজা আর প্রজা।
একদিন নাড়ী ক্ষীণ, বালিসে আলসে মাথা গোঁজা,
ভিটেমাটি বাঁধা রেখে বহু দুঃখে ডেকে আনা ওঝা—
তহবিল ফুঁকি bill-এ সব-শেষে শেষ চক্ষু বোজা।

---

১৭ সমুদয় উদ্‌ধৃতির বানান ও চিহ্নাদি প্রায় পূর্বমুদ্রিত পাঠ-অনুযায়ী, দু-একটি সুস্পষ্ট প্রমাদ কেবল সংশোধিত। দ্বিতীয় ছত্রের শেষে রবীন্দ্রনাথ 'যোঝা' লেখেন কিনা, পাণ্ডুলিপি না দেখিলে বলা যায় না।

বলা বাহুল্য এটা পুনশ্চ ডাকে মারা যাবার অভিপ্রায়েই তোমাকে লিখে পাঠালুম ; এটাতে পস্টারিটির ঠিকানার টিকিট মারা হয় নি।··· খবর পাবার আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেচি।··· যেরকম আভাস পাওয়া যাচ্চে··· কর্ত্তারা আমাদের গোরুও মারচে, আমাদের জুতোও দান করচে ; এ'কে বলে শূ-শাসন। ইতি রবীন্দ্রনাথ

—প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪৯, পৃ ৪৮১-৮২

পরে যে কৌতুকী কাব্যখণ্ড সংকলন করা যায় তাহা সোজাসুজি অধ্যাপক কালিদাস নাগকে লেখা না হইলেও 'পেন ক্লাব'এর বঙ্গীয় সভাপতি হিসাবে তিনিই যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত (?) এ রচনার হেতু বা উপলক্ষ পরিষ্কার ভাবে জানা যাইবে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি (পত্রাবলী, ৩৫৩। দেশ। ৭ পৌষ ১৩৬৮, পৃ. ৬৯৪-৯৫) হইতে—

শান্তিনিকেতন

২২শে বৈশাখ প্রত্যুষে চার ঘটিকার সময় এখান থেকে যাত্রা করে বের হব।

একটা উপলক্ষ্য আছে। পেন্ ক্লাব থেকে আমার জয়ন্তী উৎসব করবে কালিদাস [নাগ] এবং রাধারানী [দেব] মিলে এমন প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এমন নিস্তব্ধ আছেন তাঁরা যে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। বউভাতে অনিমন্ত্রিত যাওয়া চলে কিন্তু নিজের জয়ন্তীসভায় অনাহূত উপস্থিত হওয়া অসম্মানজনক, বিশেষত যখন সেই সভাটাই অবর্তমান।

কবির মান রক্ষা করতে চাও যদি বরানগরে দশজন সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ কোরো তার বেশি নয়, তার খরচ বাবদ দশ টাকা আমিই দেব। সেই "জলযোগ" ওয়ালার পরে যদি জয়ন্তী জমাবার ভার দাও তাহলে হয়তো দেশবরেণ্য সাহিত্য-সম্রাটের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে তারা নিজের ব্যবসাকে সার্থক করতেও পারে। প্রতাপকে[১৮] বলে দেব একটা গড়ে মালা কিনে নিয়ে আসবে। আবৃত্তি প্রভৃতি কবিসম্রাটের দ্বারাই হবে। গান গাবে তুমি।··· এখানকার স্থানীয় ভক্তেরা

১৮ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির তৎকালীন অন্যতম কর্মচারী।

বলচে ঐ দিনটাকে তারা দখল করতে চায়। প্রত্যুত্তরে আমি বলচি এই রকম আনুষ্ঠানিক সমারোহে নিকট আত্মীয়ের চেয়ে দূরের লোকের দাবী বেশী। কিন্তু দূরের লোক যদি দূরতম হয় তাহলে কী জবাব দেওয়া কর্ত্তব্য ভেবে পাচ্চিনে। এরা যখন শুনবে জয়ন্তী-উৎসবটা ষোলো-আনাই ফাঁকি তখন আমার মুখ লাল হয়ে উঠবে।

ইতি ৩ মে ১৯৩৬ [২০ বৈশাখ ১৩৪৩] কবি

'P.E.N. ক্লাবের বঙ্গীয় শাখা কর্তৃক কবির জন্মদিন উপলক্ষে' উক্ত সম্বর্ধনাসভা যথাকালে হয় নির্মলকুমারী ও অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরানগরের বাড়িতে, এ কথার উল্লেখ দেখি শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -প্রণীত রবীন্দ্রজীবনীর চতুর্থ খণ্ডে (অগ্রহায়ণ ১৩৭১) পৃ. ৬০।

প্রা স ঙ্গি ক ক বি তা

(মূলানুগ উদ্ধৃতি)

কবিসম্বর্ধনা-উপলক্ষ্যে

পি ই এন সমিতির সম্পাদকের প্রতি

দায়ভারগ্রস্তা বরাহনাগরিকার

প্রশস্তিবাদ

মৎস্যের তৈলেই মৎস্যের ভর্জ্জন,
সংক্ষেপে শস্তায় দায়ভার-বর্জ্জন।
গ্রামোফোনে তুলে নিয়ে সিংহের গর্জ্জন
সিংহেরই কানে ফুঁকে গৌরব-অর্জ্জন।
শুধু সাড়া দেয় তব নাসিকার তর্জ্জন,
শুধু চিঠি সই ক'রে লজ্জা-বিসর্জ্জন।

প্রহাসিনী

খেটে মরে ভেবে মরে আর যত-সজ্জন,
নিষ্ক্রিয় মহিমায় তোমার নিমজ্জন।

অনুষ্ঠাতার গুণে মুগ্ধা
শ্রীরানী মহলানবিশ
বকলম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বরানগর

সম্পাদনা ও গ্রন্থপরিচয়-রচনা : শ্রীকানাই সামন্ত
আনুকূল্য : শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক